প্রথম পরিবার

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

wbðq Awg cw_ex‡Z
Avgvi cwZwbwa †ciY
Ki‡ev| - mivevKviv

প্রথম পরিবার প্রথম পরিবার প্রথম পরিবার প্রথম পরিবার প্রথম পরিবার প্রথম পরিবার

প্রথম পরিবার

প্রথম পরিবার প্রথম পরিবার প্রথম পরিবার প্রথম পরিবার প্রথম পরিবার প্রথম পরিবার

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

প্রথম পরিবার
মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশক ঃ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

মুদ্রণ ঃ
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

প্রচ্ছদ ঃ
আব্দুর রোউফ সরকার

৭ম সংস্করণ ঃ
রবিউল আউয়াল ১৮২৯ হিঃ, মার্চ, ২০০৮ ইং

বিনিময় ঃ
পঞ্চাশ টাকা মাত্র

PROTHAM PARIBAR : Life Sketch of Hazrat Adam (As)- written by Md. Mamunur Rashid in Bengalee & Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia.

Exchange Tk. 50/- U.S. $ 10
ISBN 984-70240-0034-7

আর একবার আসুন, সূচনার স্মৃতিচারণে লিপ্ত হই আমরা। অস্বীকার করি ব্যস্ততাবিদ্ধ জীবনকে। প্রশ্ন করি, কেনো এই পারস্পরিক হিংসা হানাহানি? কেনো অস্বীকৃতির অত্বিত্ব এতো অনড়? কেনো শয়তানের শাসন এমন দূরতিক্রম্য? মানুষের মনের মাঝে দেয়াল তুলে দেয় কারা? শয়তান আর আত্মপ্রবৃত্তিই (নফছ) যে আমাদের প্রধান দুশমন– একথা কি এখনো বুঝতে পারবো না আমরা? কবে আমরা মুছে ফেলতে পারবো দ্বিধা সন্দেহের সর্বশেষ সীমারেখা?

কে আমরা? আমরা তো এক পরিবারেরই লোক। সারা বিশ্বমানুষের ইতিহাস তো সেই এক পরিবারের উঠোন থেকেই উঠে এসেছে। সেই পরিবারের ইতিহাস কি জানি আমরা সকলে? জানি কি যে, প্রেমের কোন অক্ষয় জমিনের উপর আমাদের আদি পিতা মাতা গড়ে তুলেছিলেন প্রথম পরিবার? জানি কি যে, ভুল হলে ভুল সংশোধন করে নেয়াই আমাদের প্রধান পারিবারিক শিক্ষা? অনুতাপের হাত ধরে প্রত্যাবর্তনের পথে ফিরে না এলে পতন অনিবার্য– একথা কি জানি না আমরা? না– জেনেও মানি না? চলুন তওবার তৃষিত তোরণের দিকে? ওখানেই বসবাস করে শান্তির শ্বেতকপোতেরা। চলুন সমর্পিত হই– মেনে নিই নির্বিবাদে নিয়মের নিষ্কলুষ শাসন– যে নিয়মে আমাদের প্রভু প্রতিপালক বেঁধে দিয়েছে সমস্ত নিসর্গকে। আর নিসর্গের নেতা হিসাবে আমাদেরকেও।

মানুষের মহাপরিবারের আদি-অন্ত যার অস্তিত্বের জ্যোতিচ্ছটায় আলোকিত হয়ে আছে তিনি তো এসেছেন। শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন পূর্ণ মানবতার বিধানাবলী। ইসলাম তার নাম। তাঁর আদর্শের মর্মভেদী আহ্বানের সূর্য কতো অপরূপ রূপে আলোকিত করে রেখেছে বিশ্বপরিবারের সমস্ত আকাশকে। জন্মান্ধ নাকি তোমরা– যারা এখনো পরিচিত হতে ভালোবাসো ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী হিসাবে। ইসলাম ছাড়া আল্লাহ্‌র কাছে আর কোনো দ্বীন নেই– এই অমোঘ বাণী কবে ভেদ করবে তোমাদের শ্রুতির প্রস্তরিত দেয়ালকে? কাল কি থেকে থাকে কারো জন্যে? দিনরাত্রির বিবর্তনমুখর সময় কি ক্ষমা করে কাউকে কোনোদিন? দৃষ্টি উন্নত করো। দেখো, সামনেই জ্বলছে তওবার জ্যোতির্ময় তোরণ। অতঃপর প্রত্যাবর্তন ভিন্ন আর কোন্ দায়িত্ব?

আর তোমরা? যারা ইসলামের নামে মুসলমান জামাতের মধ্যে সৃষ্টি করেছো অসংখ্য বাঁকা পথ আর মত– তারাও হুঁশিয়ার হও। হুঁশিয়ার হও কাদিয়ানি সম্প্রদায়– মেনে নাও মানুষের মহাপরিবারের শ্রেষ্ঠতম বাণীবাহক হজরত মোহাম্মদ স.ই শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী। হুঁশিয়ার হও মওদুদী সম্প্রদায়– সম্মানিত ছাহাবাবৃন্দের দোষচর্চার কারণে আল্লাহ্‌তায়ালার অভিশপ্ত মওদুদীকে পরিত্যাগ করে ফিরে এসো শয়তানবিরোধী এলাকায়। হুঁশিয়ার হও শিয়া সম্প্রদায়– পরিত্যাগ করো হেদায়েতের নক্ষত্রতুল্য ছাহাবাসমাজের সঙ্গে দুশমনির মতো অপবিত্র কার্যকলাপ। হুঁশিয়ার হও ভণ্ড পীর, অসৎ আলেম, নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধিজীবি, অহংকারী বৈজ্ঞানিক, উদাসীন সাহিত্যিক, কপট নেতা, মন্ত্রী, রাষ্ট্রনায়ক। হুঁশিয়ার হও সন্ত্রাসজীবি, মাতাল, ব্যভিচারী, শোষক, নির্যাতক, কলহপ্রেমিক, প্রতিশ্রুতিছিন্নকারী, সুদসেবক, ঘুষগ্রহিতা আর সকল পাপের পৃষ্টপোষকের দল– উচ্চারণ করো, হে আমাদের প্রতিপালক! আত্ম-অত্যাচারে বন্দী আমরা। তুমি ক্ষমা না করলে, দয়া না করলে আমরা যে ধ্বংস হয়ে যাবো প্রভু।

সামনে সুসময়। যদি হুঁশিয়ার হও।

সমস্ত স্তুতির অধিকারী আল্লাহ্‌তায়ালাই। সকল প্রকার উৎকৃষ্ট দরূদ বর্ষিত হোক মহানবী মোহাম্মদ স., তাঁর পবিত্র পরিবার-পরিজন, সত্য দ্বীনের মাপকাঠি সম্মানিত ছাহাবাবৃন্দ এবং তাঁদের সকল অনুকারকদের প্রতি। আমিন।

ওয়াস্‌সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
হাকিমাবাদ, ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

পরাজিত নই তবু।
তবু বলি নিঃসংশয়ে,- ফেরাউন, কারুণের ব্যূহ
যেখানে দ্বিখণ্ড হ'য়ে জাগে আজ দীর্ণ মানবতা,
সেই চক্রান্তের বুকে প্রশান্তির নবীন নকীব
তুলেছে নতুন ধ্বনি তৃতীয় শক্তির। সে মাটিতে
দেখি বিশ্ব মানুষের পূর্ণ সম্ভাবনা। জানি আমি
স্খলনের এ অধ্যায় তিক্ত, তিক্ততম; জানি আমি
মুষ্টিমেয় নারী নর নিম্নস্তরে পাশবিকতার
মানুষের সত্তা ভুলে জীবনের খোঁজে সার্থকতা
স্বার্থপরতার চক্রে, ছায়াচ্ছন্ন রাত্রির পর্দায়
ইবলিসের অনুগামী চলে আজও বিচিত্র মুখোশে
নর-রক্তপায়ী কিম্বা রক্ত-লোভাতুর। তবু জানি
বিকৃতির এ অধ্যায় বিভ্রান্তির প্রতিচ্ছায়া শুধু।
বিকৃত 'সভ্যতা' আর মৃত্যুমুখী পঙ্কিল কৃষ্টির
ঘূর্ণাবর্তে তবু আমি নই হতাশ্বাস। এ বিকৃতি
অতিক্রম ক'রে যাব আমি। প্রাণস্পর্শ দেব আমি
প্রাণহীন জনপদে। নব কৃষ্টি, সভ্যতা নূতন;
নূতন পৃথিবী আমি গ'ড়ে যাব রসুলের রাহে

–ফররুখ আহমদ

আমাদের অন্যান্য বই

- তাফ্সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
- মাদারেজুন নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
- মুকাশিফাতে আয়নিয়া
- মাআরিফে লাদুন্নিয়া
- মাব্দা ওয়া মা'আদ
- মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
- নূরে সেরহিন্দ
- নক্শায়ে নক্শবন্দ
- বায়ানুল বাকী
- জীলান সূর্যের হাতছানি
- চেরাগে চিশ্তি
- কালিয়ারের কুতুব
- মহাপ্রেমিক মুসা
- তুমিতো মোর্শেদ মহান
- নবীনন্দিনী
- পিতা ইব্রাহীম
- আবার আসবেন তিনি
- সুন্দর ইতিবৃত্ত
- ফোরাতের তীর
- মহাপ্লাবনের কাহিনী
- দুজন বাদশাহ যাঁরা নবী ছিলেন
- কী হয়েছিলো অবাধ্যদের
- THE PATH
- পথ পরিচিতি
- নামাজের নিয়ম
- রমজান মাস
- ইসলামী বিশ্বাস
- BASICS IN ISLAM
- মালাবুদ্দা মিনহু
- সোনার শিকল
- বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন
- সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
- তৃষিত তিথির অতিথি
- ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
- নীড়ে তার নীল ঢেউ
- ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

শেষ হয়ে গেলো আনন্দের আলোকিত অধ্যায়।

ভেঙে গেলো বেহেশতের বৈভবিত বসবাস। বেহেশত থেকে বহিষ্কৃত হলেন দু'জনই। প্রথম মানব। প্রথম মানবী। হজরত আদম। হজরত হাওয়া।

তারপর অবতরণ। অবরোহন। পতন। যেনো বিরহিনী বেহেশতের দু'চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া দু'টি অশ্রুর ধারা ক্রমাগত গড়িয়ে পড়ছে নিচে। আরো নিচে।

নামছেন তাঁরা। অন্তরে অনুতাপের লেলিহান যন্ত্রণা। সমস্ত সত্তা জুড়ে রোদনের সর্বগ্রাসী জলোচ্ছ্বাস। বেহেশতবিচ্যুত অসহায় দুই নরনারী নামছেন। নামতে বাধ্য হচ্ছেন।

পতনের এই পথপরিক্রমায় একে একে অতিক্রান্ত হচ্ছে আকাশের সকল স্তর। অতিক্রান্ত হচ্ছে বিশাল সৃষ্টির বিস্ময়ঘেরা অজস্র পরিধি। আকাশ আসছে একের পর এক। আসছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। দূরে বহুদূরে দৃষ্টির সীমানা পেরিয়ে একে একে হারিয়ে যাচ্ছে সকল আকাশ।

সপ্তম। ষষ্ঠ। পঞ্চম। চতুর্থ। তৃতীয়। দ্বিতীয়। প্রথম। সাতটি আকাশ একে একে পার হয়ে গেলো। তারপর পার হলো নক্ষত্র রাজ্য। নীহারিকা। ছায়াপথ।

তারপর হঠাৎ আলাদা হতে থাকলেন দুজনে। হজরত আদম আর হজরত হাওয়া-দু'জন দু'জনের কাছ থেকে সরে যেতে থাকলেন।

দুঃখের উপরে দুঃখ। বিপদের উপরে বিপদ। এতোদিনের যুগল জীবনে নেমে এলো প্রথম বিচ্ছেদ। এতোদিন সাথী ছিলো। সুখের সাথী, দুঃখের সাথী। কিন্তু এ কেমন জীবন এখন। সঙ্গীহীন। সঙ্গিনীবিহীন।

চল্‌ছে। বিরতিহীন পতন। অবরোহণ।

এভাবেই নামতে নামতে নামতে এক সময় পতনের প্রান্তদেশে এই পৃথিবীতে পা রাখলেন তাঁরা। সৃষ্টির প্রথম নর। প্রথম নারী। দু'জন– দু'জায়গায়।

এভাবেই পৃথিবীতে এলেন আল্লাহ্‌তায়ালার প্রথম প্রতিনিধি। এলেন অনুতাপের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে, রোদনের প্লাবনে ভাসতে ভাসতে। এলেন নিসঃঙ্গ নবী হজরত আদম আ.। এলেন তাঁর হৃদয়ের অপর পিঠ, নিঃশ্বাসের প্রতিধ্বনি– জীবনসঙ্গিনী হজরত হাওয়া আ.। এভাবেই সমাপ্ত হলো আনন্দের সর্বোচ্চ শিখর থেকে বেদনার বিচিত্র অঙ্গনের পথে অভিযাত্রিক প্রথম মানুষের পতনের পর্যায়।

সত্যি বিচিত্ররূপিণী এই বেদনা, বেদনার বিপুল অবয়ব– যার অন্তর থেকে প্রতিনিয়ত যেনো নিনাদিত হয় শাশ্বত সুন্দর সেই বাণী 'নিশ্চয় দুঃখের পরে সুখ.....দুঃখের পরে সুখ'।

সামনে কি? কোন্‌ অনাগত আমানতের দায়িত্ব বহন করতে হবে এবার কে জানে? অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। রোদনাক্রান্ত বর্তমান। শুধু অতীত– উজ্জ্বল অতীতের কথা মনে হয় বার বার।

সেই বেহেশতের কথা। সেই বালাখানা। নহর। সুন্দর অরণ্যানী। সুখ। আনন্দ। বেহেশতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়ানো। হজরত হাওয়ার নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গসুখ। সাহচর্য। সেই বেহেশত..... সেই বেহেশত.....

দিকচিহ্নহীন প্রান্তর। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু আলো আর আলো। এখানে দিন রাত্রির পরিবর্তন নেই। অন্ধকার নেই। ভয় নেই। ভীতি নেই। শংকা নেই।

এখানে সময়ের বিবর্তন নেই। সময় এখানে স্থির। শান্ত। বর্তমান। চিরবর্তমান। সুখ এখানে চিরস্থায়ী। চিরন্তন। এ যে চির আনন্দের আলয়।

এখানে সুষুপ্তি নেই তন্দ্রা নেই। নিদ্রা নেই। এখানে একটানা ঢেউ জ্যোতির। জাগরণের। এখানকার আদি-অন্ত জুড়ে শুধু সুখ। শুধু শান্তি।

মৃত্যুর অস্তিত্বও নেই এখানে। জরা নেই। অবসাদ নেই। ক্লান্তি নেই। শ্রান্তি নেই। ক্ষয় নেই। লয় নেই। এখানে শুধু জীবনের অন্তহীন জোয়ার।

এখানকার গৃহ, বৃক্ষ, নির্ঝরিণী অব্যয়– অক্ষয়। এখানে ভাঙা-গড়া নেই। উত্থান-পতন নেই। নেই সংঘর্ষ, আনন্দের সঙ্গে বেদনার। সুখের সঙ্গে দুঃখের। বৈপরিত্যের বলয় আর দোদুল্যমানতার দ্বন্দ্ব থেকে চিরনিরাপদ এ স্থানের নামই বেহেশত। জান্নাত।

এই বেহেশতেই বসবাস করেন হজরত আদম আ.। আল্লাহ্পাকের প্রিয় সৃষ্টি। বিশাল বেহেশতের প্রান্তরে বিচরণ করেন তিনি। ইচ্ছা মতো যান এদিকে সেদিকে। ঘুরে ঘুরে দেখেন বেহেশতের অফুরন্ত সৌন্দর্যরাজি। দেখেন ইয়াকুত মোতি সোনা রূপা আর আকিক নির্মিত চোখ জুড়ানো মন ভোলানো বালাখানা। দেখেন পত্রপুষ্পশোভিত হাজার বৃক্ষের সারি। দেখেন নহর। নহরের নির্মল স্রোতের নিখুঁত নিপুণ ছন্দ। দেখেন আর প্রশংসা করেন। পবিত্রতা আর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন সেই আল্লাহ্র, যিনি ইচ্ছা করলেই সৃষ্টি চলে আসে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে। শূন্যতা থেকে পূর্ণতায়। যিনি বলেন 'হও'– সাথে সাথেই সব কিছু হয়ে যায়। শক্তি তাঁর কি অসীম, অনন্ত। পরিকল্পনা তাঁর কি নির্ভুল, নিখুঁত। উদ্দেশ্য তাঁর কি মহৎ, সুন্দর।

তিনিই সৃষ্টি করেছেন সকল কিছু। এই বেহেশত। এই বালাখানা। এই নির্ঝর। তিনিই সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য ফেরেশতা, অগণিত জীবন, দৃশ্য অদৃশ্য আরো কতো কিছু। কে দেখেছে বিশাল এই সৃষ্টির পূর্ণ রূপ। সঠিক সীমানা।

ছিলো একসময়– যখন কিছুই ছিলো না। না ছিলো আকাশ। না ছিলো জমিন। না বেহেশত, নহর, বালাখানা। তখন তিনিই ছিলেন কেবল। যেমন এখন আছেন। যেমন সব সময় থাকবেন। তিনি ছিলেন একমাত্র অস্তিত্ব। বাকী সব শূন্যতা, অনস্তিত্বতা।

আল্লাহ্পাক স্থির করলেন এক সময়, তিনি প্রকাশিত হবেন। তিনি নিজের পরিচয় দান করবেন এমন এক সৃষ্টির কাছে যাকে তিনিই সৃষ্টি করবেন। আর তার জন্যই সৃষ্টি করবেন বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। তাতে থাকবে রহস্যের শত সহস্র আবরণ। থাকবে বিস্ময়ের সীমাহীন বিবর্তন। থাকবে তাঁর শক্তিমত্তা আর কৌশলের অনন্ত আয়োজন।

আল্লাহ্পাক শুরু করলেন এই বিশাল নিখিল সৃষ্টির কাজ। ধাপে ধাপে এগিয়ে চললো নির্মাণ। নিখুঁত নির্ভুল পরিকল্পনার অনুসরণে এগিয়ে চললো সৃজনের বিপুল বিকাশ।

অতুলনীয় অস্তিত্ব তাঁর। তেমনি অপরিমেয় কুদরত, শক্তিমত্তা। তাঁর হুকুমে অনস্তিত্ব রূপ নেয় অস্তিত্বে। শূন্যতা আকার নেয় পূর্ণতায়।

তিনি বললেন 'হও'। অমনি হয়ে গেলো সমস্ত সৃষ্টির সমষ্টিভূত এক আকার। সে সমষ্টিতে মিশে ছিলো আকাশ জমিনের সকল সৃষ্টির অস্তিত্ব একাকার হয়ে। এরপর আল্লাহ্পাক পৃথক করলেন সৃষ্টিকে। একটি থেকে অন্যটির অস্তিত্ব করে তুললেন স্বাতন্ত্র্যশোভিত।

রহস্যজগত, জড়জগত, আকাশের সাতটি স্তর, পৃথিবী– সব কিছু সরে যেতে থাকলো নিজ নিজ অবস্থানের দিকে। সাজিয়ে দিলেন আকাশকে এক এক করে সাতটি স্তরে। প্রথম আকাশ শোভিত হলো সূর্যের দীপ্তিতে, চন্দ্রের আভায়। নক্ষত্রেরা নিলো নয়নশোভিত রূপ। রহস্যের রূপ নিলো নীহারিকা, ছায়াপথ।

পৃথিবী পরিপূর্ণ হলো পানিতে। সে পানিতে সৃষ্টি হলো অশান্ত তরঙ্গ। বিরতিহীন তরঙ্গাভিঘাতে সৃষ্টি হলো ফেনা। ফেনার বিশাল স্তর জমাট বাঁধতে শুরু করলো। এভাবে জমাট বেঁধে তৈরী হলো জমিন। সে জমিন কাঁপতে থাকলো থর থর করে।

আল্লাহ্পাক তখন সৃষ্টি করলেন পাহাড় পর্বত। বসিয়ে দিলেন সেগুলোকে জমিনের উপর। স্থির হয়ে গেলো পৃথিবী। পৃথিবীর মাটি।

এরপর ধীরে ধীরে বিকশিত হতে লাগলো পৃথিবীর রূপ। সৃষ্টি হলো নদী নালা। সৃষ্টি হলো বনরাজী। মেঘে মেঘে ছেয়ে গেলো আকাশ। বৃষ্টি হলো। জন্ম নিলো বৃক্ষরাজি, লতাগুল্ম। ফুটে উঠলো ফুল। ছুটে এলো ভ্রমর। প্রজাপতি। উড়ে এলো পাখির ঝাঁক। উঠলো কুজন, পাখির। জাগলো আওয়াজ, ঝিল্লীর। হাজার হাজার প্রজাতির প্রাণীর। কীট পতঙ্গের। মাছের। সকল প্রাণী আল্লাহ্পাক সৃষ্টি করলেন পানি থেকে।

আল্লাহ্তায়ালা বিনা খুঁটিতে ঝুলিয়ে রাখলেন আকাশকে। চন্দ্রসূর্য গ্রহ তারার জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন কক্ষপথ। হুকুম মতো তারা পরিক্রমণ করতে লাগলো নিজ নিজ কক্ষপথ। নির্দিষ্ট সময় মতো। নির্ধারিত বিধান মতো।

স্তরে স্তরে সাতটি আকাশ সাজিয়ে সপ্তম আকাশের উপরে সৃষ্টি করলেন বেহেশত। সাত স্তর পৃথিবীর সর্বনিম্ন স্তরে সৃষ্টি করলেন দোজখ।

বেহেশতের উপরে স্থাপন করলেন তাঁর সীমাহীন পরাক্রমের প্রতীকস্বরূপ আরশে আজীম। আরশের উপরের স্তরে স্থাপন করলেন রূহের জগত। তারপর সমাসীন হলেন আরশে আজীমে, যেমন সমাসীন হওয়া তাঁর সম্মানের উপযোগী। এ অবস্থা ধারণার সীমানায় আসা অসম্ভব।

'হও' বললেই সব কিছু হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ্তায়ালা বিশাল সৃষ্টির এই সুন্দর বিন্যাসে ব্যয় করলেন ছয়দিন। ছয়দিন পর তিনি সমাসীন হলেন আরশে।

না। বিশ্রামের জন্য নয়। তিনি তো এমনই সত্তা, ক্লান্তি যাঁকে স্পর্শ করবার অধিকার রাখে না। বরং তিনি আরশে সমাসীন হলেন এজন্যে যে, এই বিশাল সৃষ্টির ক্রম-বিবর্তন এখন থেকে পরিচালিত হবে এই আরশ আজীমকে কেন্দ্র করে। আরশে আজীম সেই কুদরতেরই কেন্দ্রবিন্দু।

আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্টি করলেন ফেরেশতা। অগণিত। অসংখ্য। বিভিন্ন নির্দেশ দিলেন তাঁদেরকে। নিখুঁত নির্ভুলভাবে নির্দেশ পালনে রত হলেন তাঁরা।

আল্লাহ্পাক কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মে তাঁরা শুরু করলেন ইবাদত। আকাশ জমিন এবং সকল সৃষ্ট প্রাণী– শুরু করলো নিরবচ্ছিন্ন জিকির। নিজ নিজ ভাষায়, অবস্থায় সকল সৃষ্টি নিমগ্ন হলো আল্লাহ্তায়ালার বিরতিহীন জিকিরে। এই জিকিরের বরকতেই সৃষ্টিকুল রক্ষা করে চললো তাদের অস্তিত্ব, বংশবিস্তার, বিবর্তন।

এভাবে কতোদিন কাটলো কে জানে। এক সময় আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্টি করলেন নতুন এক সম্প্রদায়কে। তাদেরকে সৃষ্টি করলেন তিনি ধোঁয়া বিবর্জিত আগুন থেকে। তাদের নামকরণ করা হলো জ্বীন।

এরা হলেন আল্লাহ্তায়ালার অন্যান্য সকল সৃষ্টি থেকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। আল্লাহ্তায়ালার অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে তাঁর হুকুমের বিরোধিতা করবার শক্তি নেই। কিন্তু জ্বীনের মধ্যে দেয়া হলো সেই শক্তি। দেয়া হলো জ্ঞান। বলা হলো জ্ঞানের চাহিদা অনুযায়ী একথা সর্ববাদী সত্য যে, সৃষ্টিকর্তার ইবাদত সকল সৃষ্টির জন্য ফরজ (অপরিহার্য কর্তব্য)। অতএব বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির নিকট মাথা নত না করে আল্লাহ্র ইবাদত করতেই হবে। এই কর্তব্যে অটল থাকতে হবে সব সময়। না হলে আল্লাহ্তায়ালার অসন্তুষ্টি আর আজাব থেকে কারো নিস্তার নেই।

জ্বীন সম্প্রদায়কে পৃথিবীতে পাঠালেন আল্লাহ্তায়ালা। নির্ধারণ করে দিলেন, এই পৃথিবীতেই চলতে থাকবে তাদের জীবন ধারা, বংশবিস্তার। পৃথিবীর সম্পদ সৌন্দর্য সবকিছুই উপভোগ করতে পারবে তারা। কিন্তু এ কারণে আল্লাহ্তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞ

থাকতে হবে। ইবাদত করতে হবে তাঁর। আর সেই সঙ্গে রক্ষা করতে হবে পারস্পরিক সম্প্রীতি, শৃঙ্খলা। শান্তির সীমানা রক্ষা করে চলতে হবে সবাইকে।

জ্বীন সম্প্রদায় মেনে নিলো সবকিছু। ক্রমে ক্রমে বংশবিস্তার ঘটলো তাদের। পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অংশ ভরে গেলো জ্বীনে।

শান্তির সঙ্গেই বসবাস করছিলো তারা। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা দিলো মতবিরোধ, অসহিষ্ণুতা। একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলো জ্বীনেরা। শান্তির আহ্বান কানেই ঢুকলোনা তাদের। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব আর কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো তারা। শুরু হলো কলহ, বিবাদ, মারামারি, খুনাখুনি।

আগুনের তৈরী সবাই। আগুনের মতোই উদ্ধত স্বভাব জ্বীনদের। আপোষ মীমাংসার প্রতি মোটেও আকর্ষণ নেই তাদের। ফেৎনা ফাসাদই যেনো তাদের একমাত্র কামনা।

এরকম অবস্থায় আল্লাহ্তায়ালা তাদের জন্য নির্ধারণ করলেন শাস্তি। শান্তির সীমানা লংঘনের শাস্তি দেয়ার জন্য পৃথিবীতে ফেরেশতাদের এক বিশাল বাহিনী পাঠালেন আল্লাহ্পাক। ফেৎনা সৃষ্টিকারী সকল জ্বীনকে শাস্তি দিতে লাগলেন তাঁরা। যাকে সামনে পাওয়া গেলো তাকেই হত্যা করা হলো। প্রহারে প্রহারে পর্যুদস্ত করে ফেলা হলো। যারা পালাতে পারলো তাদেরও পশ্চাদ্ধাবন করে গভীর দুর্গম জঙ্গলের দিকে তাড়িয়ে দেয়া হলো। এভাবে পালিয়ে বাঁচলো কেউ কেউ। বসবাস উপযোগী স্থানে পড়ে রইলো পাপিষ্ঠ জ্বীনদের অসংখ্য লাশ।

ফেরেশতাদের নজরে পড়লো হঠাৎ একটি শিশু– একেবারেই কচি শিশু একস্থানে বসে কাঁদছে। পালাতে পারেনি সে। ফেরেশতারা দেখলেন, জ্বীন শিশুটি কী সুন্দর। দেখলে মায়া হয়। শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন তাঁরা। তাকে আদর করলেন। তারপর যখন আসমানে ফিরে গেলেন সবাই, তখন শিশুটিকেও নিয়ে গেলেন আসমানে। সেখানে ফেরেশতাদের মধ্যে ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলো সে। এই জ্বীন শিশুটির নাম ইবলিস।

ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলো ইবলিস। ইবলিস যদিও জ্বীন কিন্তু ফেরেশতাদের মধ্যে লালিত পালিত হওয়ার কারণে স্বভাব চরিত্র তার হলো ফেরেশতাদেরই মতো। ফেরেশতাদের মতোই সে সারাক্ষণ ইবাদত বন্দেগীতে সময় কাটাতে লাগলো।

এভাবে হাজার হাজার বৎসর ইবাদত করলো সে। আল্লাহ্পাক ইবাদতের কারণে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিলেন। সে হয়ে গেলো ফেরেশতাদের নেতা। হয়ে গেলো ফেরেশতাদের শিক্ষক। জমিন ও আকাশের সকল স্থানে সে আল্লাহ্পাকের ইবাদত করলো। সকল স্থানে সেজদা করলো।

এভাবে গত হয়ে গেলো হাজার হাজার বৎসর। তারপর একদিন–

পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন আল্লাহ্পাক। স্থির কররেন, পৃথিবীতে প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করবেন তিনি নতুন এক সৃষ্টিকে। তার নাম হবে আদম।

জ্বীন নয়। ফেরেশতা নয়। মাটির পৃথিবীর জন্য প্রয়োজন মাটির তৈরী মানুষের।

আল্লাহ্পাক ফেরেশতাদের সমাবেশ ডাকলেন। তাদের সমানে ঘোষণা করলেন, 'আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করতে চাই।'

ফেরেশতাদের তখন মনে পড়ে গেলো জ্বীনদের কথা। তারাও প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছিলো পৃথিবীর। তারপর শুরু করেছিলো কী রকম অন্যায় আচরণ। শুরু করেছিলো অশান্তি হানাহানি রক্তপাত।

সেই বিষিত বিশ্বের কথা স্মরণে আসতেই ফেরেশতারা নিবেদন করলেন, 'প্রভু পরওয়ারদিগার! আপনি কি দুনিয়ায় এমন কোনো সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে চান, যারা সেখানে আবার ঘটাবে অশান্তি, ঘটাবে রক্তপাত। অথচ আমরাই আছি আপনার অনুগত বান্দা। আমরাই তো নিরন্তর আপনার প্রশংসা এবং পবিত্রতা বর্ণনা করছি যেরূপ আপনার নির্দেশ।'

'আল্লাহ্তায়ালার অটল সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো অতঃপর 'নিশ্চয় আমিই জানি– যা জানো না তোমরা।'

ফেরেশতারা নীরব হয়ে গেলেন। আল্লাহ্পাকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সত্যিই তিনিই তো জানেন সবকিছু। আদি-অন্ত, প্রকাশ্য-গোপন– সকল কিছুতো তাঁরই জ্ঞানের আওতায়।

ফেরেশতারা নূরের তৈরী। তাঁরা মাসুম-নিষ্পাপ। আল্লাহ্পাক যা হুকুম করেন, তার বরখেলাপ করার সাধ্য তাঁদের নেই। কিন্তু আল্লাহ্পাকের প্রতিনিধি হবার যোগ্যতা নেই তাদের। প্রতিনিধি তো তাকেই বলে, যে তার প্রতিনিধিত্বের কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন, মুক্ত। তার কাছে থাকতে হবে অমূল্য এক সম্পদ-প্রজ্ঞা, জ্ঞান। আর থাকতে হবে প্রেমময় অন্তর। বিরুদ্ধ পরিবেশে হবে তার প্রতিনিধিত্বের পরীক্ষা। বিস্মৃতির অন্ধকারে তাকে প্রজ্জ্বলিত রাখতে হবে আল্লাহপাকের স্মরণের অনির্বান জ্যোতিশিখা। প্রেম ও প্রজ্ঞার হবে জয়। চিরবিজয়।

কিন্তু ফেরেশতাদের তো ওসব কিছু নেই। যদিও নূর তাঁরা। যদিও নিষ্পাপ– তবুও প্রেমহীন। প্রজ্ঞাহীন।

প্রজ্ঞার অধিকারী করেছিলেন আল্লাহ্পাক জ্বীনদেরকে। দিয়েছিলেন পৃথিবীর প্রতিনিধিত্বও। কিন্তু তারা তো আগুনের তৈরী। আগুনের মতোই উদ্ধত স্বভাব তাদের। তাদের সে উদ্ধত স্বভাবের প্রচণ্ড প্রতাপে তারা নিজেরাই নিভিয়ে দিয়েছিলো আল্লাহ্তায়ালার প্রধানতম নেয়ামত– প্রজ্ঞার আলো। যোগ্যতার বিচারে ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে তারা।

তাই পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব বহনের জন্য এবার আসবে নতুন এক সৃষ্টি। নতুন এক রহস্যময় জীবন। সেখানে আলো আছে। অন্ধকারও আছে। পূণ্য আছে। পাপও আছে। আছে প্রবল বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি। আছে বন্ধুর যাত্রা পথ। আছে স্খলন আর পতনের সীমাহীন সুযোগ। সেখানেই প্রকৃত মানুষেরা প্রতিনিধিত্ব করবে অন্য সমস্ত সৃষ্টির। সকল জীবনের। সমস্ত নিসর্গের। প্রজ্ঞার দিকনির্দেশনা দিয়ে আর প্রেমের শক্তি দিয়ে সকল বিরুদ্ধবাদিতা জয় করে আল্লাহ্পাকের সন্তুষ্টির অক্ষয় মনজিলের দিকে এগিয়ে চলবে সে– আল্লাহ্র প্রতিনিধি। সেই বিপুল যোগ্যতা দিয়ে আদম সৃষ্টির পরিকল্পনা করলেন আল্লাহ্তায়ালা।

হুকুম হলো, পৃথিবীর সকল স্থান থেকে একটু একটু করে মাটি সংগ্রহ করতে হবে। ফেরেশতারা হুকুম তামিল করলেন। লাল, শাদা, কালো-যতো বর্ণের মাটি আছে পৃথিবীতে, সবধরনের মাটি সংগ্রহ করা হলো। নরম, শক্ত– বিভিন্ন প্রকৃতির মাটি জমা করা হলো। তারপর সকল রঙের সকল প্রকৃতির মাটি পরিণত করা হলো পঁচা কাদায়। বিচিত্র সেই কর্দম ধারণ করলো চটচটে আঠালো রূপ। তারপর শুকিয়ে শক্ত করা হলো সে মাটিকে। পোড়া মাটির মতো সেই মাটি খন্ খন্ করে বাজবার মতো হয়ে গেলো।

তখন সেই মাটিকে আল্লাহ্পাক তাঁর অসীম কুদরতে আকার দিলেন আদমের। এভাবেই সৃষ্টি হলো আদমের সুন্দর শরীর। সুন্দর, কিন্তু নিষ্প্রাণ। নিঃসাড়।

আল্লাহ্তায়ালা আদেশ করলেন, 'হও'। অমনি জীবন্ত হয়ে গেলেন আদম। দেহের সঙ্গে সংযোজিত হলো রূহ– প্রাণ।

এই রূহের ইতিহাস আছে। শুধু আদমের রূহ নয়। সমস্ত আদম সন্তানের রূহ অনেক আগেই সৃষ্টি করে রেখেছিলেন আল্লাহ্তায়ালা। সে আর এক জগত। সেই জগতের নাম আলমে আরওয়াহ (রূহের জগত)। সেই রূহের জগতে আল্লাহ্তায়ালা সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর পেয়ারা হাবীব হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর রূহ। তারপর সেই রূহ থেকে অনেক রূহ। অসংখ্য রূহ। সমস্ত মানুষের রূহ।

সমস্ত রূহের উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করেছিলেন এই কথা, 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই?'

সমস্ত রূহ সমস্বরে জবাব দিয়েছিলো, 'হাঁ। তুমিই আমাদের প্রভু।'

সেও অনেক আগের কথা। হাজার হাজার বছর আগের কথা। সেই রূহের জগত থেকে হজরত আদম আ. এর দেহে এই প্রথম রূহ সংযোজিত করা হলো এক রহস্যময় কৌশলে। না। দেহের ভিতরে নয়, বাইরেও নয়– এমন এক অবোধ্য নিয়মে রূহ সম্পর্ক স্থাপন করলো সৃষ্টির প্রথম মানুষের শরীরের সঙ্গে। সুকৌশলী আল্লাহ্পাকের এ এক অসীম কুদরত। জ্ঞান ধারণায় যার সঠিক স্বরূপ বুঝতে পারা কিছুতেই সম্ভব নয়। শুধু বিস্ময়ের সাথে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ্পাকের এই কথাঃ 'বলে দাও রূহ তাঁর প্রতিপালকের হুকুম।'

উঠে দাঁড়ালেন প্রথম মানুষ। আল্লাহ্তায়ালার প্রথম প্রতিনিধি। প্রথম খলিফা।

আল্লাহ্তায়ালা হুকুম করলেন তাঁকে, যাও ফেরেশতাদের কাছে। সালাম দাও তাদেরকে। সালামের জবাব শোনো। এই সালাম প্রতি সালামের বাক্য মনে রেখো। সামনে এমন সময় আসবে যখন তোমার সন্তান সন্ততিতে ভরে যাবে পৃথিবী। তখন পরস্পরের শান্তি সম্ভাষণের বাক্য হবে আজকের এই সালাম আদান প্রদানের বাক্যাবলী।

ফেরেশতাদের সমাবেশে হাজির হলেন হজরত আদম আ. বললেন, আস্সালামু আলাইকুম। শান্তি বর্ষিত হোক আপনাদের সকলের প্রতি।

সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতারা জবাব দিলেন, 'ওয়া আলাইকুমুস্ সালামু ওয়া রহমাতুল্লাহ্– আপনার উপরও বর্ষিত হোক শান্তি এবং রহমত।'

আল্লাহ্তায়ালার প্রতিনিধি সৃষ্টি হবার পর প্রথম বসলো শান্তির অনুষ্ঠান। জানানো হলো হয়তোবা, শান্তি প্রতিষ্ঠাই প্রতিনিধির মূল কাজ। শান্তির সাধনাই প্রতিনিধির প্রধানতম সাধনা।

আল্লাহ্তায়ালার আদেশে সমাপ্ত হলো শান্তির প্রথম সম্মেলন। সালাম আর প্রতিসালামের বরকতে সমগ্র সৃষ্টিতে উঠলো শান্তির দোল। সমস্ত সৃষ্টি যেনো এই

প্রথম পেলো অভাবিত শান্তির স্বাদ। হজরত আদম যেনো অনুভব করলেন তাঁর সমস্ত শিরায়, পাঁজরের সকল অস্থিতে, অন্তরের প্রতিটি পরতে শান্তির নূরানী তরঙ্গ উথাল পাথাল করছে।

এরপর আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদমকে দান করলেন জ্ঞান, প্রজ্ঞা। তিনি যেমন সমস্ত মানুষের মধ্যে প্রথম মানুষ, তেমনি জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডারের প্রথম পাঠ শিক্ষা দেওয়া হলো তাঁকেই। সমস্ত মানবতার শিরোনাম হজরত আদম আ.। তাই তিনি লাভ করলেন সমস্ত জ্ঞানের শিরোনামসম্মত জ্ঞান। সমস্ত সৃষ্টির নাম জানতে পারলেন তিনি। এরপর তাঁরই বংশধরগণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিকশিত হবে এ সমস্ত নামের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ গবেষণা। এ জ্ঞানের সংক্ষিপ্তসারের বাহক তিনি। আর এ জ্ঞানের বিস্তৃতি ফুটে উঠবে আগামী অনাগত মানুষের বংশবিস্তৃতির মাধ্যমে।

হজরত আদমের শ্রেষ্ঠত্ব এই জ্ঞানের কারণেই। ফেরেশতারা নূরের তৈরী, নিষ্পাপ। আল্লাহ্তায়ালার একান্ত বাধ্যগত বান্দা। কিন্তু তাদেরতো নেই জ্ঞান আহরণের ক্ষমতা। নেই জ্ঞান ধারণের অতিরিক্ত যোগ্যতা।

আল্লাহ্তায়ালা চাইলেন, হজরত আদমের শ্রেষ্ঠত্ব আর যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত হোক সবাই। আল্লাহ্তায়ালার এই প্রতিনিধির মর্যাদা স্বীকার করে নিক সকলে।

তাই তিনি আবারো সমবেত করলেন ফেরেশতাদেরকে। সমাবেশ বসলো চতুর্থ আসমানে। এই সমাবেশে ইবলিসও হাজির ছিলো।

আল্লাহ্তায়ালা সেখানে হাজির করলেন অনেক দ্রব্য সামগ্রী। তারপর ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে এরশাদ করলেন, 'তোমাদের সত্যবাদিতার সমর্থনে প্রমাণ দেখাও। বলো, এ সমস্ত বস্তুর নাম কি? এসবের বিবরণ দাও সংক্ষেপে।'

ফেরেশতারা পূর্ণ বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিলেন, হে প্রভু পরওয়ারদিগার! পাক পবিত্র আপনি। আমাদেরকে যতটুকু জানিয়েছেন আপনি, তার চেয়ে বেশী কিছু তো আমরা জানি না। নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে জ্ঞাত এবং আপনি তো সুকৌশলীও।

তখন আল্লাহ্ আদেশ দিলেন আদমকে, বলে দাও এসবের বিবরণ।

হজরত আদম হুকুম তামিল করলেন। এক এক করে তিনি সমস্ত বস্তুগুলির নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ বললেন।

আল্লাহ্তায়ালা তখন বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আকাশ পৃথিবীর সকল প্রকার গোপন তথ্য আমি জানি। তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো আর যা কিছু গোপন রাখো– সবই জানা আছে আমার।'

জ্ঞানের এই প্রথম পরীক্ষায় পরাজিত হলেন ফেরেশতারা। তাঁরা সবাই মেনে নিলেন হজরত আদমের শ্রেষ্ঠত্ব। সবাই বুঝলেন আল্লাহ্তায়ালার বাণীই সত্য, চিরসত্য– 'ইন্নি আ'লামু মালা তা'লামুন– নিশ্চয় আমি জানি, যা তোমরা জানো না।'

আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য হুকুম দিলেন সবাইকে। তাদের সঙ্গে ইবলিসের প্রতিও জারী হলো একই হুকুম।

আল্লাহ্পাক হুকুম দিলেন, 'আদমকে কেবলা করে তার সম্মানার্থে সেজদা করো।'

সকল ফেরেশতা হুকুম তামিল করলেন। সবাই সেজদাবনত হলেন হজরত আদমের সামনে। শুধু ইবলিস ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র সে-ই এই প্রথম অমান্য করলো আল্লাহ্পাকের নির্দেশ। কী ভয়ানক ধৃষ্টতা। কী নিদারুণ দুর্ভাগ্য। কী নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্য।

কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা মহামহিম। সীমাহীন ধৈর্য তাঁর। তিনি ইবলিসকে সঙ্গে সঙ্গেই শাস্তি দিতে পারতেন। সঙ্গে সঙ্গেই দেখিয়ে দিতে পারতেন অবাধ্যতার আজাব কতো ভয়ানক। কিন্তু তিনি তা করলেন না। বরং প্রশ্ন করলেন, 'তুমি আদমকে সেজদা করলে না কেনো?'

শয়তান জবাব দিলো 'কেনো তাকে আমি সেজদা করবো? আমি যে আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সে তো আমার তুলনায় নিম্নমানের সৃষ্টি। আমাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে আর আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। আগুনের গতি ঊর্ধ্বমুখী আর মাটির গতি নিম্নমুখী। আমি, এই অযৌক্তিক আদেশ মেনে নিতে পারি না।'

কে না বুঝবে যে ইবলিসের এই যুক্তি যুক্তিহীন। এরকম যুক্তি প্রদর্শন যে চরম মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্টি নির্দ্বিধায় আল্লাহ্পাকের নির্দেশ পালন করবে। এ নিয়মের বিরুদ্ধে যুক্তির অবকাশ কোথায়? আল্লাহ্পাকের

সকল সৃষ্টিই তাঁর নির্দেশ মেনে নেয় নির্বিবাদে। কিন্তু ইবলিসই প্রথম প্রদর্শন করলো অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত। তার সঙ্গে অবাধ্যতার সপক্ষে দেখালো যুক্তি।

আল্লাহ্তায়ালা অসুন্তষ্ট হলেন ইবলিসের প্রতি। এরশাদ করলেন, 'নেমে যা এখান থেকে। তোর অহংকার অশোভনীয় এখানে। বের হয়ে যা শীঘ্রই। আজ থেকে অনন্তকালের জন্য তোকে বয়ে বেড়াতে হবে ধিক্কার আর অভিশাপের শাস্তি।'

আগুনের তৈরী ইবলিস। আগুনের মতোই তার ছিলো টকটকে লাল চেহারা। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার অভিশাপ নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারা হয়ে গেলো কদর্য কয়লার মতো কালো। সে হয়ে গেলো অভিশপ্ত শয়তান। চিরদিনের মতো।

তবুও ভীত হলো না শয়তান। আপন কৃতকর্মের জন্য এতটুকুও অনুতপ্ত হলো না সে। বরং প্রতিহিংসার আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। মনস্থির করলো সে, প্রতিশোধ নিতে হবে। চরমতম প্রতিশোধ। হাজার হাজার বছর ইবাদত করে কিনা আজ এই ফল। এর জন্য আদমই দায়ী। তাই তার প্রতি নিতে হবে প্রচণ্ড প্রতিশোধ। নিতেই হবে।

কিন্তু এই প্রতিশোধ–পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে হলে যে আল্লাহ্তায়ালার কাছেই প্রার্থনা জানাতে হবে। আল্লাহ্তায়ালা শক্তি না দিলে কী করে সে শায়েস্তা করবে আদমকে। হাজার হাজার বছর ইবাদত করেছে সে। এর বিনিময়ে আজ কি একটি প্রার্থনা কবুল হবে না তার?

শয়তান নিবেদন করলো, 'আমাকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকার অধিকার দিন।'

আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করলেন, 'মঞ্জুর করা হলো তোর প্রার্থনা।'

শয়তান তখন বললো, 'আদমের জন্যই আজ আমার এই দুর্দশা। আমি কসম করে বলছি, আমি আদম এবং তার বংশধরদেরকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করবার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকবোই। সামনে পিছনে ডানে বামে– সবদিক থেকে আমি তাদের প্রতি চালাবো আক্রমণ। বিপথগামী করবো তাদেরকে। তারপর আপনি দেখতে পাবেন তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ প্রমাণিত হয়েছে।'

আল্লাহ্পাক এরশাদ করলেন, 'এখান থেকে তোর বহিষ্কার ধিক্কার আর অভিশাপের সঙ্গে হোক। নিশ্চিত জেনে নে, মানুষের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে, আমি তাদেরকে দিয়ে পরিপূর্ণ করবো জাহান্নাম।'

তবুও হতোদ্যম হলো না শয়তান। দম্ভ আর প্রতিহিংসার নেশায় সে মত্ত। সে বললো 'আপনি তো আদমের জন্যই আমাকে আজ সর্বহারা করলেন। আমি তার বংশধরদের সামনে অসৎকর্ম আর অবাধ্যতাকে মনোরম রূপে প্রদর্শন করবো।

তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো। তবে একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে, আপনার খাঁটি বান্দারা বেঁচে যেতে পারবে।'

আল্লাহ্তায়ালা বললেন, 'আমার খাঁটি বান্দা হওয়াই একমাত্র সোজা পথ। সিরাত্বল মুস্তাকিম। এই পথই তার পথিককে পৌঁছে দেয় আমার সান্নিধ্যে। আমার এরকম খাঁটি বান্দাদের উপর তোর কোনো প্রভাবই কার্যকর হবে না। অবশ্য ভ্রষ্টরা তোর অনুগামী হবে। ভ্রষ্টদের জন্য আমি নির্ধারণ করে রেখেছি দোজখের দাবানল। সেই দোজখের থাকবে সাতটি স্তর। প্রতি স্তরের জন্য থাকবে স্বতন্ত্র তোরণ। প্রতিটি তোরণের মধ্য দিয়ে দোজখে অনুপ্রবেশকারীরা থাকবে পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে।'

এভাবে সমাপ্ত হলো হজরত আদমের অভিষেক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শেষে চতুর্থ আসমান থেকে আল্লাহ্পাক তাঁকে তুলে নিলেন সপ্তম আসমানের উপরে– বেহেশতে।

আর শয়তান বিতাড়িত হলো চিরদিনের জন্য। অভিশপ্ত হলো চিরকালের জন্য। সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকলো সে। প্রতিশোধ গ্রহণের সময় কি আসবে না? নিশ্চয়ই আসবে।

বেহেশতের বাগানে একা একা ঘুরে বেড়ান হজরত আদম। কখনো বহমান নির্ঝরিণীর পাড়ে, কখনো ফলবান বৃক্ষের নিচে, কখনো পুষ্পের উদ্যানে। ঘুরে বেড়ান আর বিমোহিত হন আল্লাহ্পাকের নিখুঁত সৌন্দর্যসম্ভার দেখে। চারিদিকে পবিত্র জ্যোতির সয়লাব।

হজরত আদমের অন্তরে আপনা আপনিই যেনো সারাক্ষণ অনুরণিত হয়– সোবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ্ বিল্লাহিল আলিইল আজীম– পবিত্রতা আল্লাহ্তায়ালার, প্রশংসাও আল্লাহ্তায়ালারই, তিনি ছাড়া উপাস্য নেই আর কেউ, তিনি তো মহান, শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্র সাহায্য এবং শক্তি ছাড়া আর কারো কোনো শক্তি নেই, সাহায্যও নেই। তিনিই সর্বোচ্চ, তিনিই মহান।

মাঝে মাঝে ফেরেশতাদের সঙ্গে তাঁর সালাম বিনিময় হয়। ফেরেশতারা মোবারকবাদ দেন তাঁকে। খেদমতের জন্য ছুটে আসে হাজারো হুর, হাজারো গেলেমান। কিন্তু তবু কিসের যেনো এক সূক্ষ্ম অস্বস্তিতে মাঝে মাঝে ভরে আসে মন। হজরত আদম দেখেন ফেরেশতা হুর গেলেমান সবারই সাথী আছে, সবারই দল আছে। কিন্তু আদম যে একা। নিঃসঙ্গ মানুষ তিনি। আল্লাহ্তায়ালার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে একক মানুষ।

বেহেশতের এতো সুখ। এতো শান্তি। আনন্দের এতোকিছু উপকরণ। তবু অন্তর অশান্ত কেনো? নিঃসঙ্গতার বেদনায় অন্তর ভারাক্রান্ত হয়। অদৃশ্য কোন্ এক কাঁটা যেনো অন্তরে বিঁধে আছে সারাক্ষণ। মন বিরাগী হয়ে ওঠে। মনে মনে শুধু একটি প্রশ্নই যেনো তার সহস্র তরঙ্গ নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়, অবুঝ মন– হয়েছে কি তোমার?

আলেমুল গায়েব আল্লাহ্তায়ালা। মানুষকে তিনিই দিয়েছেন প্রেমময় অন্তর। দিয়েছেন বিদগ্ধ হৃদয়। সে হৃদয়ের বেলাভূমিতে নিরন্তর আনন্দ বেদনার কতো শত ঢেউ যে আছড়ে পড়ে– তার সব খবরই জানা তাঁর। তিনি যে অন্তর্যামী।

আল্লাহ্পাক হজরত আদমের অন্তর প্রশান্ত করবার ব্যবস্থা নিলেন। একদিন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন হজরত আদম। এক সময় ঘুমিয়েও পড়লেন। তখন তাঁর বুকের পাঁজরের একটি হাড় থেকে আল্লাহ্পাক সৃষ্টি করলেন হজরত হাওয়াকে।

সৃষ্টির প্রথম নারী হজরত হাওয়া। সৃষ্টির প্রথম রমণী তিনি। হজরত আদমের বুকের পাঁজর। হৃদয়ের প্রেম। নিঃশ্বাসের প্রতিধ্বনি। জীবনের জীবন।

হজরত আদমের শিয়রের পাশে বসলেন হাওয়া। বিমুগ্ধ নয়নে দেখতে লাগলেন আদমকে। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলো আদমের। ত্রস্তে উঠে বসে তিনি বিস্ময় আর আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলেন হাওয়াকে দেখে। চোখে চোখ পড়বার আগে দৃষ্টি অবনত করলেন হাওয়া। একি লজ্জা। লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠলেন তিনি।

হজরত আদম চোখ ফেরাতে পারেন না। কে এই নবীনা? এতো আপন কেনো মনে হয় তাকে। এতো রূপ, এতো যৌবন তার। বেহেশতের সকল রূপসী হুর যেনো ক্রীতদাসী তার কাছে। এ রমণী কে? এই সুন্দরী যে মুহূর্তেই অধিকার করে ফেলেছে অদৃশ্য অন্তরের সকল পরত। আর দেহকে করেছে উন্মাদ, উম্মাতাল।

নিজের অজান্তেই কখন যেনো আদম আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে চাইলেন হাওয়াকে। অমনি প্রত্যাদেশ হলো, 'ক্ষান্ত হও। বিনা বিবাহে তুমি হাওয়াকে স্পর্শ করতে পারবে না।'

হজরত আদমের অন্তরে বিবাহের সংকল্প প্রবল হয়ে উঠলো। তখন আল্লাহ্তায়ালা শুভবিবাহের আয়োজন করলেন। আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছায় অসংখ্য

ফেরেশতা সমবেত হলেন বিবাহ অনুষ্ঠানে। ফেরেশতাদের সামনে বিবাহের সাজে সজ্জিত করা হলো হজরত আদম এবং হজরত হাওয়াকে।

প্রথম মানব এবং প্রথম মানবীর প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠান। পবিত্র এ অনুষ্ঠানে উঠলো আনন্দের সীমাহীন জোয়ার। মুহুর্মুহু সোবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ ইত্যাদি পবিত্র ধ্বনিতে মুখরিত বিবাহের মজলিশ। শুভবিবাহ সম্পন্ন হলো এক সময়। তারপর আমন্ত্রিত সকল মেহমান ফেরেশতা বিদায় নিলেন একে একে।

একান্তে বসে রইলেন সদ্য বিবাহিত দুলহা ও দুলহান। মানবতার প্রথম আত্মীয়তার আলাপন এবার। প্রথম মিলনের লগন। প্রথম স্বামী। প্রথম স্ত্রী। হাওয়াকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে উদ্যত হলেন আদম। অমনি প্রত্যাদেশ হলো আদমের প্রতি–

'মিলিত হওয়ার আগে দেনমোহর পরিশোধ করতে হবে।'

হজরত আদম আরজ করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক, কি দিয়ে পরিশোধ করবো দেনমোহর।'

আল্লাহ্তায়ালা জানালেন, 'আমার হাবীব হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ শরীফ পড়তে হবে দশবার।'

হজরত আদম নিবেদন করলেন, 'হে প্রভু পরওয়ারদিগার! মোহাম্মদ স. কে? তাকে দেখতে ইচ্ছা করি আমি।'

আল্লাহ্তায়ালা জানালেন, 'সে তোমারই আগামী বংশধরদের একজন। তাঁর জন্যই সৃষ্টি করেছি আমি তোমাকে হাওয়াকে সমস্ত ফেরেশতাকে সমস্ত সৃষ্টিকে।'

দশবার দরূদ শরীফ পড়লেন হজরত আদম। দরূদ শরীফের বরকতে নূরে নূরে ভরপুর হয়ে গেলো হজরত আদমের অন্তর বাহির। নূরে নূরে ভরপুর হয়ে গেলো প্রথম বিবাহ বাসর। মিলিত হলেন হাওয়া ও আদম। প্রেম সমুদ্রের অশান্ত তরঙ্গমালা ভেদ করে গভীরে আরো গভীরে ডুব দিলেন তাঁরা। দু'জনেই হারিয়ে ফেললেন যেনো সকল অনুভূতি, বোধচিহ্ন। একাকার হয়ে গেলেন তাঁরা। হারিয়েই গেলেন যেন তারা চিরদিনের জন্য। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন। শুধু জেগে রইল প্রেম। শাশ্বত সুন্দর চিরন্তন প্রেম।

এক সময় যখন তাঁদের হুঁশ হলো, আল্লাহ্তায়ালা তখন জানালেন তাঁর নির্দেশ, 'হে আদম তুমি আর তোমার সঙ্গিনীর বসবাস স্থান এই বেহেশত। তোমরা স্বাধীন সকল প্রকার পানাহারের জন্য, সকল স্থানে বিচরণের জন্য। কিন্তু ঐ বৃক্ষটির নিকটবর্তী হয়ো না কখনো। যদি হও তবে অত্যাচারীদের অন্তর্ভূত হয়ে যাবে তোমরা।'

ঐ বৃক্ষটির নাম গন্ধম বৃক্ষ।

আল্লাহ্তায়ালার সাবধানবাণী শুনে শংকিত হয়ে পড়লেন আদম ও হাওয়া। মনে রাখতে হবে আল্লাহ্তায়ালার এই নির্দেশ। এখানে সহস্র বৃক্ষের সারি, শত ঝর্ণার সংগীত, অসংখ্য পুষ্পোদ্যান আর বালাখানার বৈভব– সব কিছুই হালাল তাঁদের জন্য। শুধু মনে রাখতে হবে ঐ বৃক্ষের কথা। ঐ সর্বনাশা নিষিদ্ধ বৃক্ষের কথা। আদম ও হাওয়া দু'জনেই সাবধান হয়ে গেলেন। বেহেশতের অপার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষটির উপস্থিতি কী ভয়ংকর।

বিতাড়িত শয়তান মনের দুঃখে কালাতিপাত করে। অন্তরে তার প্রতিহিংসার লেলিহান আগুন। বিতাড়িত অভিশপ্ত এই জীবন দুর্বিষহ। অথচ ছিলো একদিন যখন আল্লাহ্র নিরবচ্ছিন্ন ইবাদতের মধ্য দিয়ে নিরুপদ্রব সময় অতিবাহিত করেছে সে। লাভ করেছে আল্লাহ্তায়ালার সীমাহীন মেহেরবানি। আর আজ সে আল্লাহ্তায়ালার অসন্তুষ্টির স্বীকার। বিতাড়িত। লাঞ্ছিত। অপমানিত। অভিশপ্ত।

আদমই সকল অনিষ্টের মূল। তাকে শায়েস্তা করতে হবে। তাকেও বিতাড়িত করতে হবে বেহেশত থেকে। বেহেশত থেকে তাকেও টেনে আনতে হবে পৃথিবীতে। কিন্তু কেমন করে?

শয়তান ভাবে আর ভাবে। কিন্তু ভাবনার কোনো কূল খুঁজে পায় না। হঠাৎ সে বুদ্ধি বের করে– যে ভাবেই হোক একবার– শুধু একবার যদি বেহেশতে কোনোরকমে পৌঁছানো যেতো, তবে আদম আর তার স্ত্রী হাওয়াকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করতে পারতো সে। সহজ সরল জীবন আদম হাওয়ার। প্রতারণা কাকে বলে, তারা জানে না। প্রতারণার পথ ধরে তাদের স্খলন ঘটানো হয়তো সম্ভব। আশায় বুক বাঁধে শয়তান।

তারপর এক সময় ফেরেশতার রূপ ধরে সে উড়াল দেয় আকাশে। কৌশলে ফেরেশতাদেরকে ধোঁকা দিয়ে একে একে অতিক্রম করে আকাশ। ফেরেশতারা চিনতে পারে না তাকে। ভাবে তারা, এও এক বিচরণকারী ফেরেশতা।

সপ্তম আকাশের উপরে বেহেশত। বেহেশতের প্রতিটি তোরণ সুরক্ষিত। সারাক্ষণ সেখানে প্রহরা থাকে ফেরেশতাদের। শয়তান অপেক্ষা করতে থাকে। অপেক্ষা করতেই থাকে। এক সময় চেষ্টা সফল হলো তার। অত্যন্ত সন্তর্পণে বেহেশতে প্রবেশ করলো সে। প্রবেশ করেই সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের কাছে গেলো। সেখানে বসে থাকলো একেবারে ভালো মানুষের মতো। দেখলে মনে হয় যেনো কোনো সাধু পুরুষ। আল্লাহ্তায়ালার ইবাদত ছাড়া আর কোনোদিকেই তার খেয়াল নেই যেনো।

আদম ও হাওয়া নিষিদ্ধ বৃক্ষ থেকে দূরে দূরেই থাকতেন। মাঝে মাঝে কী এক আকর্ষণ বোধ করতেন তারা ঐ বৃক্ষটির প্রতি। এ কিরূপ বিস্ময়কর প্রবৃত্তি। মানুষের এ এক সহজাত আকর্ষণ। যা কিছু নিষিদ্ধ, মানুষ যেনো তারই দিকে ছুটে যেতে চায়। আদম হাওয়া মাঝে মাঝেই তাকান বৃক্ষটির দিকে। কী সুন্দর বৃক্ষ। কী সুন্দর তার পত্রপল্লব। কী সুন্দর তার ফল।

হঠাৎ একদিন তাঁরা দূর থেকে দেখতে পেলেন, কে একজন অচেনা আগন্তুক বসে আছে ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষটির কাছে। মনে হয় উদাসীন সে সমস্ত কিছু থেকে। মনে হয় সে যেনো ডুবে আছে আল্লাহতায়ালার ধ্যানে।

কৌতুহলী হয়ে উঠলেন আদম হাওয়া। এও মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি। নতুন কিছু দেখলে কৌতুহলের উদ্রেক হয়। জানতে ইচ্ছে হয়। বুঝতে ইচ্ছে করে।

এখানে এতোদিন তো এ দৃশ্য কখনো দেখেননি তাঁরা। এখানে এতোদিন ধরে বসবাস করছেন তাঁরা। এখানে তো কোনোকিছু অচেনা নয় তাঁদের। শুধু ঐ বৃক্ষটি তাঁদের কাছে রহস্যঘেরা এক বৃক্ষ। জানেন না তাঁরা, বেহেশতের অসংখ্য বৃক্ষের মধ্যে কেনো ঐ একটি বৃক্ষ নিষিদ্ধ হয়েছে তাঁদের জন্য। আজ আবার নিষিদ্ধ বৃক্ষের কাছে কে এসে উপস্থিত হয়েছে হঠাৎ।

একপা দু'পা করে তাঁরা এগিয়ে যান অচেনা আগন্তুকটির দিকে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁরা ভালো করে দেখতে থাকলেন আগন্তুকটিকে।

আগন্তুকই মুখ খুললো প্রথম। বললো, 'শংকার কোনো কারণ নেই। আমি তোমাদের একান্ত শুভাকাঙ্খী। আমাকে বিশ্বাস করতে পারো তোমরা।'

কিছুক্ষণ থেমে শয়তান আবার বললো 'এতোদিন ধরে তোমরা বাসবাস করছো বেহেশতে। কিন্তু তোমাদের সামনে রয়েছে বিপদ। অচিরেই আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে বেহেশত থেকে বের করে দিবেন। পাঠাবেন পৃথিবীতে। তোমরা তো জাননা পৃথিবী কী রকম জায়গা। সেখানে শুধু কষ্ট আর বিপদ।'

আদম হাওয়া নিরুত্তর রইলেন। বেহেশতচ্যুতির সংবাদ শুনে চিন্তিত হলেন তাঁরা।

শয়তান আবার বললো, 'অথচ ইচ্ছা করলে তোমরা বেহেশতেই থেকে যেতে পারো চিরদিনের জন্য। আমি তোমাদের কল্যাণ কামনা করি। আমার কথা শোনো। নিষিদ্ধ এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করো যদি, তাহলে এই বেহেশতেরই স্থায়ী অধিবাসী হতে পারবে তোমরা।'

শিউরে উঠলেন আদম ও হাওয়া। এ কী করে সম্ভব। এতে যে আল্লাহ্তায়ালার অবাধ্যতা করা হবে?

তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে ক্ষণিকের জন্য হতাশ হলো শয়তান। তারপর আরো নরম হয়ে গেলো সে। এবার সে একেবারে পরম আত্মীয়ের মতো বোঝাতে লাগলো তাদেরকে, 'যাই বলো না কেনো তোমরা। এতে আমার তো আর কোনো লাভ নেই। তোমাদের ভালোর জন্যই আমি বলছিলাম একথা। তোমরা জানো না তাই একথা জানাচ্ছিলাম তোমাদেরকে। আমি তোমাদের একান্ত আপনজন। পৃথিবীতে যেয়ে তোমরা কষ্ট পাবে। সে কষ্ট আমার পক্ষে অসহ্য। তাই বলছিলাম। আল্লাহ্তায়ালা যে এই বৃক্ষের কাছে আসতে তোমাদেরকে মানা করেছেন, তার কারণ আছে। সবেমাত্র তোমরা সৃষ্টি হয়েছো তখন। এই গাছের ফল খেলে তোমাদের তখন ক্ষতিই হতো। আল্লাহ্তায়ালার প্রিয় তোমরা। আল্লাহ্তায়ালা তো তোমাদের ক্ষতি চাইতে পারেন না। তাই নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু এখন তো তোমরা পরিণত। বেশেতের পরিবেশে তোমরা এখন স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছো। এখন আর কোনো বাধা নিষেধ নেই। এখন এ ফল না খেলেই বরং তোমাদেরকে চলে যেতে হবে পৃথিবীতে। পৃথিবীর অনিশ্চিত ঐ জীবন থেকে পরিত্রাণ কি চাও না তোমরা? আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য কার কামনা নয়? অল্প কয়েকটা মাত্র ফল খেলেই চলবে। আর তাছাড়া তোমাদের নিয়ত তো অসাধু নয়। আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য লাভের জন্যই তো তোমরা বেহেশতে থাকতে চাও চিরকাল। আর সে জন্যই তো এই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করা।'

শয়তানের মধুর কথা শুনে হজরত হাওয়ার মন নরম হয়ে গেলো। আহা বেচারা আগন্তুক সাধু পুরুষতো সৎ পরামর্শই দিয়েছে। এতে তার তো কোনো লাভ নেই। লাভ তো আমাদেরই। আর আমাদের নিয়ত তো আর খারাপ নয়। আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্যইতো আমাদের কাম্য। মেহেরবান আল্লাহ্তায়ালা অন্তর্যামী তিনি তো জানবেনই, কী নিয়তে আজ এই গাছের ফল খাবো আমরা।

প্রতারণা আর মিথ্যাচার কাকে বলে তা একেবারেই জানা ছিলো না আদম ও হাওয়ার। তাঁদের সরল প্রাণে শয়তান সুকৌশলে ঢুকিয়ে দিলো প্রলোভনের বিষ। শয়তানের প্রতারণার অচিন্তনীয় কৌশলের কারণে সে বিষ তাদের দু'চোখে প্রতিভাত হলো অমৃতরূপে।

হজরত হাওয়া একেবারেই গলে গেলেন শয়তানের কথায়। খেয়ে ফেললেন কয়েকটি ফল সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের। তারপর হজরত আদমকে বললেন, 'খাও।'

প্রিয়তমার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না হজরত আদম। তিনিও খেয়ে ফেললেন কয়েকটি গন্ধম ফল।

মুহূর্তকাল পরেই আদম হাওয়া বুঝতে পারলেন, তাঁরা কী সর্বনাশা কাজ করে ফেলেছেন। আগন্তুক সাধুপুরুষটি যে শয়তান, তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলেন তাঁরা। শয়তান পালিয়ে গেলো মুহূর্তেই। সফল হলো তার চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র।

ভয়ানক এক বিপদের অশনি সংকেতে কেঁপে উঠলেন হজরত আদম আর হজরত হাওয়া। বেহেশতের বালাখানা, নির্ঝরিণী, পুষ্পোদ্যান হাহাকার করে উঠলো। হায় হায় করে উঠলো সকল হুর গেলেমান। ফেরেশতারা হয়ে গেলো স্তম্ভিত। একি করেছেন আদম ও হাওয়া। বেশেতের অফুরন্ত নেয়ামতের মধ্যে ডুবে থেকেও আল্লাহ্তায়ালার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি আদম তাঁর সঙ্গিনীকে নিয়ে কী নিদারুণ আচরণ করলেন আজ।

আল্লাহ্তায়ালার বিধান অলংঘনীয়। তাঁর নির্ধারিত নিয়মে আগুন পোড়ায়, পানি পিপাসা মেটায়, সূর্য চন্দ্র আলো দেয়। তাঁর নির্ধারিত নিয়ম অলংঘনীয়। এ-ও তার নির্ধারিত নিয়ম যে, গন্ধম বৃক্ষের ফল ভক্ষণকারী বেহেশতে বসবাসের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে মুহূর্তেই।

তাই হলো। ভুলের আগুনে ঝলসানো অন্তর আদম হাওয়ার। হায় একি ভয়াবহ কাজ করেছেন তাঁরা। বেহেশতের সকল সুখ যে দ্রুত অতিদ্রুত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তাঁদের কাছ থেকে। আল্লাহ্র হুকুম অমান্যকারীদের সঙ্গে কেউ আর সম্পর্ক রাখতে চায় না। এমনকি পরনের পোশাকও। নিরাবরণ হয়ে পড়লেন তাঁরা। পোশাকের আবরণ খসে পড়লো। নগ্ন হয়ে পড়লেন আদম ও হাওয়া। দু'জন দু'জনকে দেখে লজ্জায় মুখ ঢাকলেন তাঁরা। কী অপমান। কী লজ্জা।

লজ্জায় অপমানে উন্মাদপ্রায় হয়ে গেলেন দু'জনে। এভাবে শয়তান অপমান করলো আল্লাহ্তায়ালার সম্মানিত প্রতিনিধি আর তাঁর সঙ্গিনীকে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন আদম হাওয়া। বেহেশতের লতাপাতা ছিঁড়ে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করতে লাগলেন তাঁরা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। একদিক আবৃত করতে গেলে আরেক দিক হয়ে পড়ে নগ্ন।

একি ভয়ানক আজাব। লজ্জার– এই আজাবের কাছে শত সহস্র দোজখের আগুন যে কিছুই নয়। চিৎকার করে কাঁদতে থাকলেন আদম হাওয়া। রোদনের অবিশ্রাম আওয়াজে ভরে গেলো চারিদিক। এরই মধ্যে তাঁরা শুনতে পেলেন আল্লাহ্তায়ালার প্রত্যাদেশ–

আমি কি ঐ বৃক্ষ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করে দেইনি। শয়তান, তোমাদের চরমতম শত্রু– একথা কি আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেইনি?'

আল্লাহ্তায়ালার প্রত্যাদেশে শুধু অনুতাপ আর অপমানের আগুন জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে। লজ্জা আর অনুশোচনার সর্বধ্বংসী তুফান যেনো নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় সবকিছু। দু'জনে তারা কেঁদে ওঠেন আরো জোরে। বারবার কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে নিবেদন করতে থাকনে তাঁরা, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা অপরাধী। নিজেরাই আমরা ডেকে এনেছি আমাদের সর্বনাশ। যদি আপনি ক্ষমা না করেন, যদি আপনি দয়া না করেন, তবে আমরা যে ধ্বংস হয়ে যাবো প্রভু।'

বারবার এভাবে বিলাপ করতে থাকলেন হজরত আদম আর হজরত হাওয়া। বারবার উচ্চারণ করতে লাগলেন–

রব্বানা জলামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফিরলানা অতারহামনা লানা কুনান্না মিনাল খসিরীন.....।

এরি মধ্যে জারী হয়ে গেলো আল্লাহ্তায়ালার অটল নির্দেশ–

'নেমে যাও নিচে। সেখানে তোমাদেরকে শয়তানের সঙ্গে শত্রুতার মধ্যে সতর্ক জীবন যাপন করতে হবে।'

শেষ হয়ে গেলো আনন্দের আলোকিত অধ্যায়। বেহেশতবিচ্যুত প্রথম মানব আর প্রথম মানবী ক্রমাগত নামতে থাকলেন নিচে। একে একে অনেক আকাশ ভেদ করে চলতে লাগলো অবতরণ। অবরোহন। পতন।

সারা নিসর্গ যেনো ম্লান হয়ে গেলো মুহূর্তেই। চারিদিকে উঠলো শোকের মুর্ছনা। হাহাকারে ভরে গেলো আকাশ বাতাস। নির্বাক অসংখ্য ফেরেশতা স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন তাঁদের দিকে। আল্লাহ্তায়ালার প্রিয় সৃষ্টি মানুষের একি নির্মম পরিণতি। শুধু স্মরণ করতে থাকলেন তাঁরা আল্লাহ্তায়ালার সেই চিরন্তন বাণী 'ইন্নি আ'লামু মালা তায়ালামুন।' নিশ্চয় আমি জানি– যা জানো না তোমরা। 'কি অপার

রহস্য যে লুকিয়ে আছে এই বেদনাবিধুর ঘটনায় কে জানে? ভবিষ্যতের জ্ঞান তো কারো জানা নেই। কারোরই জানা নেই। সকল জ্ঞানের অধিকারী যে একমাত্র আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু। ঐ কথাই সত্য যা তিনি বলেন, 'নিশ্চয় আমি জানি– যা জানো না তোমরা।'

এক সঙ্গেই নামছিলেন তাঁরা। প্রথম আকাশের নিচে এসে হঠাৎ আলাদা হয়ে গেলেন দু'জনে। তারপর অসহায় একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় শেষে পৃথিবীর মাটিতে পা রাখলেন তাঁরা। হজরত আদম অবতরণ করলেন সিংহল দ্বীপে। আর হজরত হাওয়া জেদ্দায়।

তারপর একটানা রোদনের অধ্যায়। শতশত বৎসর চলে যায় কাঁদতে কাঁদতে। দ্বীপদেশ সিংহলে আদম আর সমুদ্র উপকূল জেদ্দায় হাওয়া কেঁদেই চলেন সারাক্ষণ। কাঁদেন আর প্রার্থনা জানান মহামহিম আল্লাহ্তায়ালার দরবারে–

রব্বানা জলামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফিরলানা অতারহামনা লানা কুনান্না মিনাল খসিরীন।

–হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যে নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। আপনি ক্ষমা না করলে, দয়া না করলে আমরা যে ধ্বংস হয়ে যাবো প্রভু।

কখনো বলতে লাগলেন তাঁরা, 'হে আমার আল্লাহ! তুমি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। তুমি পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা তো তোমারই। নিজের প্রতি অত্যাচারী নিরূপায় আমি তোমার কাছেই ক্ষমাপ্রার্থনা করি– তুমি যে শ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী। হে আমার আল্লাহ্! আমি নিশ্চিত বিশ্বাস করি, তুমিই একমাত্র মা'বুদ। তুমি পবিত্র । সকল প্রশংসার অধিকারী তুমি। নিকৃষ্ট আমি নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছি নিজেই। দয়া করো মেহেরবান প্রভু– তুমি যে শ্রেষ্ঠ দয়াবান। আমি নিরূপায় সর্বহারা। অতএব তুমি আমার তওবা কবুল করো। তুমি তো তওবা কবুলকারী। অতিশয় দয়ালু।'

হজরত আদম কাঁদেন সিংহলে। দু'চোখ বেয়ে অবিরল ঝরে অশ্রুধারা। যে অশ্রুর বিরাম নেই। যে অশ্রু বয়ে যায় নদীর মতো নিরন্তর, নিরবধি। নদীর তীরে তীরে জন্ম নেয় ফুল ও ফলের অগণিত বৃক্ষ। তারাও কাঁদে। হজরত আদমের শোকে শোকাতুর হয়– বৃক্ষরাজি, নদী-সমুদ্র, সমস্ত নিসর্গ।

ওদিকে হজরত হাওয়া একটানা কেঁদে চলেন বিরান সমুদ্রপোকূল জেদ্দায়। তাঁর কান্নার অশ্রুতে নেমে আসে বন্যা, প্লাবন। শোনা যায়, অশ্রুর ধারা থেকে সৃষ্টি হয়েছে মেহেদি বৃক্ষ। অশ্রুমিশ্রিত বালুকণা পরিণত হয়েছে সুরমায়। আর যে অশ্রুস্রোত মিশে গিয়েছে সাগরে, সেগুলো পরিণত হয়েছে মুক্তায়।

শত বছর কেটে গেলো কাঁদতে কাঁদতে। তবুও বিরতি নেই রোদনের। আরো অতিক্রান্ত হলো শত বছর। তবুও থামে না অশ্রু। এরপর আরো শত বছর কেটে গেলো যখন, তখন প্রশমিত হলো শোক। স্তিমিত হলো অনুশোচনার অনল।

আল্লাহ্তায়ালার ক্ষমার জ্যোতিসমুদ্রে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হলেন তাঁরা। বুকের পাথর নেমে গেলো যেনো। আল্লাহ্তায়ালার দয়ার নির্মল বাতাসে তাঁরা প্রাণ ভরে নিলেন নতুন নিঃশ্বাস। ক্ষমাপ্রাপ্তির আনন্দে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো অতীতের সমস্ত বেদনারোধ। মনে হলো সারা অন্তরটাই যেনো এবার পরিণত হয়েছে সুখময় বেহেশতে।

কিন্তু আর এক বেদনায় যে অন্তর আচ্ছন্ন হয়ে আসে– জীবনের নিঃসঙ্গতা দূর হবে কেমন করে? হাওয়ার কথা মনে পড়ে যায় আদমের। কোথায় কি অবস্থায় আছে সে, কে জানে। এই বিশাল বিরান পৃথিবীতে কী করে তাঁকে খুঁজে বের করা সম্ভব। সঙ্গিনীর বিরহ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠেন আদম।

ওদিকে হজরত হাওয়াও হয়ে পড়েন বিরহবিধুরা। না জানি কোথায় এখন তিনি। পথ ঘাট জানা নেই। অজানা অচেনা এই পৃথিবীতে কোথায় আদম। কে বলে দিবে তাঁর ঠিকানা।

আল্লাহ্পাক রহম করলেন তাঁদের প্রতি। একদিন হজরত জিবরাইল আ. হাজির হলেন হজরত আদমের কাছে। হাজির হয়ে আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ জানিয়ে দিলেন তাঁকে, 'হে আদম। আপনি মৃত্যু আসবার আগে হজ্জ্ব সমাধা করুন।'

মৃত্যুর কথা শুনে শংকিত হয়ে পড়লেন আদম। মৃত্যুর মুখোমুখি যে হতেই হবে একদিন। এই পৃথিবীর জীবন যে নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী। নিরূপায় মানুষ মৃত্যু থেকে তোমার নিস্তার নেই।

মনস্থির করলেন হজরত আদম। তিনি হজ্জ্ব করতে যাবেন। পথের সন্ধান দিলেন হজরত জিবরাইল আ. তাঁর নির্দেশিত পথ ধরে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন তিনি।

দূরের পথ। দিনশেষে বিশ্রামের জন্য থামতে হয় বিভিন্ন মনজিলে। নিশাবসানে আবার শুরু হয় পথ চলা।

এভাবে চলতে চলতে এক সময় তিনি হাজির হলেন মক্কায়। বহু বছর আগে সেখানে ফেরেশতারা প্রথম নির্মাণ করে রেখেছিলেন কাবা শরীফ। সাত আসমানে অবস্থিত বায়তুল মামুর মসজিদের আদলে নির্মিত কাবা শরীফে সব সময় ফেরেশতারা তওয়াফ করতেন।

হজরত আদম কাবা শরীফ তাওয়াফ করলেন। নামাজ আদায় করলেন। আল্লাহ্তায়ালা তখন সন্তুষ্ট হয়ে জান্নাতের অনেক জ্যোতির্ময় তাঁবু থেকে একটি তাঁবু স্থাপন করলেন কাবা শরীফের উপর। তাঁবুটি ছিল লাল ইয়াকুত পাথরের তৈরী। তাঁবুটি বেহেশতের তাঁবুর মতোই ছিলো নূরে ভরপুর। তাঁবুর চারটি কোণে ছিলো শুভ্র ও উজ্জ্বল ইয়াকুত পাথর। ফেরেশতারা এসে ঘিরে রাখলেন সেই তাঁবুকে। জ্বীন শয়তানেরা যেনো কাবাগৃহ দেখতে না পায়, সে কারণেই ফেরেশতারা বেষ্টন করে রাখলেন কাবা শরীফকে। সমবেত ফেরেশতারা বিরতিহীন ভাবে পাঠ করে চললেন, সোবহানাল্লাহ্...আলহামদুল্লিাহ্ ..... আল্লাহু আকবার....।

আল্লাহ্তায়ালার আরশ থেকে দলে দলে ছুটে এলেন ফেরেশতারা। আরশের মাকাম থেকেই তাঁরা এহরাম বেঁধে লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক বলতে বলতে কাবা গৃহের দিকে ছুটে আসতেন। হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করে তাঁরা তওয়াফ শুরু করতেন। তারপর দুই রাকাত নামাজ শেষে পুনরায় ফিরে যেতেন আকাশের দিকে।

কাবা শরীফের সাথে সাথে বেহেশত থেকে হাজরে আসওয়াদ নামের এই জ্যোতির্ময় পাথর খণ্ডটি অবতীর্ণ হয়েছিলো। হজরত আদম আ. সেই পাথরটিকে মাঝে মাঝেই জড়িয়ে ধরেন আবেগে। চুম্বন করেন আর বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেন আল্লাহ্তায়ালার ক্ষমা ও মহত্বের এক অভূতপূর্ব নিদর্শন। পৃথিবীর মতো নিকৃষ্ট এই স্থানে শুধু তাঁর জন্য, শুধু মানুষের জন্য তিনি নাজিল করেছেন এই ইবাদতগৃহ– কা'বা। রক্তিমবর্ণ ইয়াকুত প্রস্তর নির্মিত এই গৃহটির পূর্ব পশ্চিম দিকে রয়েছে দু'টি দরোজা। দরোজা দু'টিতে রয়েছে নূরের প্রদীপ। আর দীপাধারগুলি নির্মিত হয়েছে বেহেশতের নিখাদ সোনা দিয়ে।

হজ্বের সকল আহকাম পালনের পর একান্ত বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহ্পাকের উদ্দেশ্যে আরজ করলেন হজরত আদম, 'হে আমার আল্লাহ্! প্রত্যেক কর্মের বিনিময় দেওয়াই তো তোমার নিয়ম।'

আল্লাহ্তায়ালা জানিয়ে দিলেন, 'হে আদম, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তোমার পরবর্তী বংশধরগণের মধ্যে যারা এই কা'বা গৃহের জেয়ারত করে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাদেরকেও ক্ষমা করে দিব।'

হজ্জের কিছুদিন পর একদল ফেরেশতা সাক্ষাৎ করলেন হজরত আদমের সঙ্গে এবং জানালেন, 'আপনার হজ্ব আল্লাহ্তায়ালা কবুল করে নিয়েছেন। আমরা আপনার দুই হাজার বছর আগে প্রথম হজ্ব সমাধা করেছি।'

হজরত আদম জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি দোয়া পড়তে তোমরা হজ্বের সময়?'

ফেরেশতারা জানালেন, 'আমরা পড়তাম– সোবহানাল্লহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবর।

হজরত আদম আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করেন কখনো কখনো। হাওয়ার কথা মনে হয় বার বার। কে জানে সে অভাগিনী এখন কোথায়। একাকীত্ব যে ক্রমে ক্রমে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। সাথীবিহীন জীবন তপ্ত মরুভুমির মতো। অসহ্য। হজরত আদম মাঝে মাঝেই দোয়া প্রার্থনা করেন আল্লাহ্তায়ালার কাছে। প্রার্থনা করেন, 'এ বিরহ যাতনার অবসান করে দাও প্রভু। আমরা একসঙ্গে আবার শুরু করি নতুন জীবন। দ্বীন দুনিয়ার সুখ দুঃখ সবকিছু ভাগ করে নিই আমরা একসাথে।'

একদিন মোনাজাত শেষ না হতেই তিনি যেনো শুনতে পেলেন কার পায়ের মৃদু শব্দ। মোনাজাত শেষ করেই দেখলেন হাওয়া, এগিয়ে আসছেন তাঁর দিকে। চোখে মুখে তাঁর দীর্ঘদিনের একটানা রোদনের চিহ্ন। এখনো লেগে আছে অশ্রুর দাগ। বিরহবিধুরা বিপর্যস্তা স্ত্রীকে দেখে হজরত আদম প্রায় দৌড়ে গেলেন তাঁর দিকে। জাড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। হজরত হাওয়াও জড়িয়ে ধরলেন স্বামীকে। তারপর চললো একটানা রোদন।

পৃথিবীর আকাশ বাতাস মরুভুমি সবাই এই প্রথম দেখলো প্রথম মানব আর মানবীর প্রেমালিঙ্গনের দৃশ্য। কী সুন্দর। কী অপরূপ।

শুরু হলো সংসার জীবন। প্রথম মানব আর প্রথম মানবীর। পৃথিবীর প্রথম সংসার প্রতিষ্ঠিত করলেন তাঁরা। মাটির মানুষ। মাটি দিয়ে কাদা দিয়ে লতাপাতা

দিয়ে পৃথিবীতে প্রথম বাসর রচনা করলেন আদম হাওয়া। পৃথিবীর প্রথম গৃহ পরিপূর্ণ হলো প্রেমে প্রীতিতে অনাবিল আনন্দে।

হজরত জিবরাইল আ. তাঁদেরকে শিখালেন সবকিছু। শিখালেন কীভাবে বস্ত্র বয়ন করতে হয়। শিখালেন কীভাবে চাষাবাদ করে ফসল ফলাতে হয়। কীভাবে ফসল কাটতে হয়। ফসলের খোসা ছাড়িয়ে খাদ্য শস্য সংগ্রহ করতে হয়।

আরো শিখালেন আগুনের ব্যবহার। আগুনে সেঁকে কিভাবে তৈরী করতে হয় খাদ্য। এতো আর বেহেশত নয়। চাইলেই সব কিছু পাওয়া যাবে। এ হচ্ছে মাটির পৃথিবী। এখানে পরিশ্রম করে সবকিছু সংগ্রহ করতে হয়। শ্রম আর ঘামের জীবন এখানে। ক্লান্তির পরে অবসর। শ্রান্তির পরে বিশ্রাম। এখানে আল্লাহ্‌র ইবাদতের সাথে সাথে নিত্যকার সাংসারিক কাজ।

এখানে সকাল হয়। দিন বাড়তে থাকে। শুরু হয় সংসারের কাজ কাম। দিন শেষে সন্ধ্যা হয়। আসে রাত্রি। বিশ্রামের জন্য। বিশ্রাম শেষে আবার আসে দিন। আবার শুরু হয় সংসার। নতুন উদ্যমে। নতুন অনুপ্রেরণায়।

এখানে মওসুম বদল হয়। ঋতু পরিক্রমার পথ ধরে বার বার ঘুরে ঘুরে আসে শীত গ্রীষ্ম বরষা বসন্ত। কতো সুন্দর করে আল্লাহ্‌তায়ালা সাজিয়ে রেখেছেন এই মাটির পৃথিবী। বেহেশতের মতো নিরবচ্ছিন্ন সুখ নেই এখানে। এখানে সুখের সাথে জড়িয়ে আছে দুঃখ। আনন্দের সাথে জাড়িয়ে আছে বেদনা।

এখানে আছে চোখ জুড়ানো মন ভুলানো হাজারো নিসর্গ। আছে পশুপাখি, ভ্রমর প্রজাপতি। আছে হাজারো কীট পতঙ্গ। আছে হাজারো রকমের মৌসুমী ফুল। মৌসুমী ফল। এখানে আছে মৃত্যু সকল সৃষ্টির জন্য। এখানে সকল জীবনকে এক নির্ধারিত নিয়মে গ্রহণ করতে হয় মৃত্যুর আস্বাদ। এখানে পাখিরা মরে যায়। রেখে যায় তাদের নতুন বংশধরদের। বৃক্ষ নিঃশেষ হয়। রেখে যায় ফল। রেখে যায় নতুন চারা। শুধু ঐ পাহাড়গুলো নির্বিকার। আর নদীগুলো বয়ে চলে নিরবধি। আর জেগে থাকে জোয়ার সাগরের।

আর জেগে থাকে জিকির সারানিখিলের। সমস্ত নিসর্গের। নিরবধি নিখিল প্রকৃতি জুড়ে জারী থাকে জিকিরের মর্মস্পর্শী অনুরণন। আদম হাওয়ার অন্তরও সেই জিকিরের অবিশ্রান্ত প্রবাহে আন্দোলিত হয়। আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ মতো তাঁরা সমর্পিত হন ইবাদতে।

ওই দূর আকাশ কী অদ্ভুত। স্তম্ভবিহীন ওই অসীম আকাশ কী নিশ্চিন্তে ঝুলে আছে অনন্তকাল থেকে। কী রহস্য যে লুকিয়ে আছে ওই বিশাল আকাশে। আকাশের ছায়াপথে। নিঃসীম নীহারিকালোকে। কী নিখুঁত নিয়মে আপন আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে নক্ষত্ররাজি। সূর্য। চন্দ্র। আল্লাহ্‌তায়ালার নিরবচ্ছিন্ন জিকিরে মত্ত তারা সবাই। পালন করে চলে আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ, শৃংখলা।

আর ওই আকাশটা কতো রং যে ধরে। এক এক সময় এক এক রকম। সকালের সময় রঞ্জিত হয় সূর্যোদয়ের রক্তিম আভায়। খররৌদ্রে হয়ে যায় গাঢ়ো নীল। আবার সূর্যাস্তের সময়ে রূপ নেয় রক্তের। আর মেঘগুলো ভাসে হাওয়ায়। আকাশ আবৃত করে কখনো তোলে ঝড়। কখনো বৃষ্টি। ভেলার মতো ভাসতে ভাসতে মেঘগুলো চলে যায় কোন্ দূর দেশে কে জানে।

মওসুমে মওসুমে বদলে যায় হাওয়ার গতি। কখনো দখিনা বাতাস আনে বেহেশতি শান্তির স্মৃতি। কখনো আসে খরতপ্ত লু হাওয়া কখনো বয় সাইমুম ঝড়। কখনো ডেকে আনে আকাশে রাশি রাশি মেহমান মেঘমালা। কখনো তাড়িয়ে দেয় তাদেরকে। নিয়ে আসে নির্মেঘ আকাশ।

রাত তো আর এক বিস্ময়। সারা বিশ্বনিখিল ডুবে যায় সুষুপ্তির গভীর অরণ্যে। নিভে যায় জীবনের চঞ্চলতা। তখন কখনো চাঁদ ওঠে আকাশে। জ্যোৎস্নার বন্যায় ডুবে যায় চরাচর। আবার কখনো জ্বলে ওঠে চন্দ্রহীন আকাশে অগণিত তারার মেলা। নক্ষত্রখচিত আকাশের তখন সেকি রহস্যময় রূপ। দৃষ্টি অবনত হয়ে আসে। আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা, প্রশংসা আর শ্রেষ্ঠত্বের জিকিরে ভরে যায় অন্তরের অতলান্ত পরিধি। মস্তক অবনত হয়ে আসে আপনা আপনি। সেজদায় অবনত না হয়ে যেনো অন্তর শান্তি পায় না আর কোনোকিছুতেই।

অন্তরে প্রতিধ্বনিত হয় আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র সেই বাণী, 'নিশ্চয় আকাশ পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে আর দিনরাত্রির বিবর্তনের মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য রয়েছে চিন্তার উপাদান.....'

আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্টি সবকিছুই সুন্দর। যেমন সুন্দর বেহেশত, তেমনি পৃথিবীও। প্রকৃত আল্লাহপ্রেমিকগণ যে সবখানেই দেখতে পান আল্লাহ্তায়ালারই নিখুঁত সৃষ্টিকৌশল। বেহেশতবিচ্যুতির খেদ মনে রেখে আর কি হবে। মাটির এই পৃথিবী আবাদ করবার জন্য এই পৃথিবীতে আগমনই যে তকদীরের লিখন। এ পৃথিবীতে আগমন যে আল্লাহ্তায়ালারই অভিপ্রেত। তিনি যে আগেই ঘোষণা করেছেন, 'আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করব।'

কিন্তু ধৃষ্টতা নয়, অহংকার নয়, আত্মপক্ষ সমর্থন নয়– নিজ কৃতকর্মের কারণে অনুতাপ ও তওবার পথই হলো আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির পথ।

আল্লাহ্তায়ালার সীমাহীন দয়া আর অন্তহীন ক্ষমার অধিকারী তো পাপীরাই। যে অপরাধের সঙ্গে অহংকার নেই, আছে নম্রতা, বিনয় আর রোদন– সে অপরাধ যে অপরাধই থাকে না আর। অপরাধ হয়ে যায় অবিকল মর্যাদা। পাপ পরিণত হয় পুণ্যে। এই পথই সহজ সরল পথ। এই পথই সিরাতল মুস্তাকীম। পতনের পথ ধরে এই পৃথিবীতে নেমে এসেই এ পথেরই পরিচয় লাভ করেছেন আদম ও হাওয়া। এই পথেই চলতে হবে সকল মানুষকে। শয়তান আর প্রবৃত্তির প্ররোচনায়

মানুষ হয়তো ভুল করবে। কিন্তু তাতে কি ক্ষতি। উন্মুক্ত তো রয়েছেই তওবার তোরণ। তওবার তোরণাভিসারী মানুষই তো আল্লাহ্তায়ালার পেয়ারা সৃষ্টি। মর্যাদায় তারা নিষ্পাপ ফেরেশতারও ঊর্ধ্বে।

সন্তানসম্ভবা হলেন হজরত হাওয়া। বুঝলেন তিনি, তাঁর উদরে বেড়ে উঠছে আগামী বংশধর। কথাটা জানালেন তিনি স্বামীকে।

হজরত আদম প্রার্থনা জানালেন আল্লাহ্তায়ালার দরবারে, 'হে আমাদের করুণাময় প্রতিপালক, আমাদেরকে সৎসন্তান দান করুন, যাতে আমরা আপনার কৃতজ্ঞতা পালন করতে সমর্থ হই।'

হজরত হাওয়ার উদর স্ফীত হতে থাকে ধীরে ধীরে। এক অজানা আনন্দের শিহরণে ভরে যায় তাঁর মন। তাঁর সাথে জেগে ওঠে অজানা এক আশংকারও। জানা নেই, কি এক রকমের কষ্ট যেনো অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। আনন্দ আর আশংকার এক অনাবিল মধুর অনুভূতিতে তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন মাঝে মাঝে।

যখন প্রসব বেদনা শুরু হলো, তখন কেঁদে ফেললেন তিনি। আল্লাহ্পাকের নিকট ধৈর্য প্রার্থনা করলেন। তারপর প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় এক সময় দেখলেন একই সঙ্গে দু'টি নিষ্পাপ মানব শিশু জন্ম নিয়েছে। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। সদ্যজাত শিশুদেরকে দেখে তাঁর অন্তর ভরে গেলো অনাস্বাদিত এক আনন্দে। পৃথিবীতে প্রথম মা হলেন তিনি। গ্রহণ করলেন প্রথিবীর প্রথম প্রসববেদনার স্বাদ। আর হজরত আদম লাভ করলেন প্রথম পিতৃত্বের পুরস্কার।

শিশুরা বড় হতে থাকে। অবুঝ শিশুরা। হাত নাড়িয়ে খেলা করে আপন মনে। খিদে লাগলে কাঁদে। হজরত হাওয়া বুকের দুধ খাওয়ান তাঁদেরকে। শান্ত হয় শিশুরা।

শিশুরা বড় হয়। হামাগুড়ি দেয়। বসতে শেখে। হাঁটতেও শেখে ধীরে ধীরে। বাবা আদম তাদেরকে আদর করেন। মা হাওয়া কোলে নেন। সদ্য ফোটা ফুলের

মতো পবিত্র শিশুরা তাদের কচি কচি হাত দিয়ে একবার জড়িয়ে ধরে মাকে। খেলা করে কোল জুড়ে। আবার কখনো জড়িয়ে ধরে বাবাকে। কোলে ওঠে। পিঠে ওঠে।

হজরত আদম নাম রাখেন তাদের। ছেলের নাম কাবিল। মেয়ের নাম আকলিমা।

আবারো গর্ভবর্তী হন হাওয়া। এবারও প্রসব করেন যমজ সন্তান। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। হজরত আদম ছেলের নাম রাখেন হাবিল আর মেয়ের নাম রাখেন লিমুজা। তারাও বড় হয়।

এভাবে জোড়ায় জোড়ায় সন্তান প্রসব করতে থাকেন হজরত হাওয়া। সংসার বড় হয়। ব্যস্ততা বেড়ে যায় হাওয়ার। কোলের শিশুদের দুধ খাওয়ানো। বড়দের যত্ন নেয়া। কখনো মৃদু শাসন। কখনো স্নেহবিজড়িত তিরস্কার। শিশুরা কি চঞ্চল। খেলাধুলা হৈ চৈ করে। খামাকা জ্বালাতন করে মাকে। উত্যক্ত করে বাবাকে। তবু ভালো লাগে। শিশুদের জ্বালাতন, কিশোরদের দুষ্টুমি সবই ভালো লাগে। মাতা পিতা দু'জনে দেখেন আর বিমোহিত হন। এ যেনো চাঁদের মেলা।

কাবিল আর আকলিমা বড় হলো। হাবিলের সাথে তার গর্ভবোন লিমুজাও বড় হলো। যৌবনে পদার্পণ করলেন তাঁরা সকলেই। মাতা পিতা মনস্থির করেন বিবাহ শাদী দিতে হবে ছেলে মেয়েদের। এই এতো বড় সংসার। কতো আর সামলাবেন মা হাওয়া। একই সঙ্গে এতোগুলো ছেলেমেয়ে সামলানো তো চাট্টিখানি কথা নয়। তার উপর আছে রান্না বান্না। স্বামীর খেদমত। গৃহপালিত পশুদের খবরদারি।

আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ এলো যমজ ভাই বোনেরাই আপন ভাইবোন। অন্যদেরকে দূরবর্তী আত্মীয় মনে করতে হবে। আর বিয়ে আপন ভাই বোনদের মধ্যে হবে না। অপরদের সঙ্গে হবে। সেই হিসেবে আকলিমার সাথে বিয়ে দিতে হবে হাবিলের। আর কাবিলের সাথে লিমুজার।

আকলিমা ছিলেন সুন্দরী। লিমুজা ততোটা নয়। গোল বাধলো এখানেই। কাবিল বেঁকে বসলো। গোঁ ধরে বসলো, লিমুজাকে সে কিছুতেই বিয়ে করবে না। বিয়ে করবে আকলিমাকে। বিস্মিত হয়ে গেলেন হজরত আদম। একি রকম ছেলে। পিতার সিদ্ধান্ত মানতে চায় না। আল্লাহ্তায়ালার বিধানের পরোয়া করে না।

হজরত আদম অনেক বোঝালেন কাবিলকে। বললেন, প্রিয় পুত্র আমার। আমরা তো আল্লাহ্তায়ালার বান্দা। আল্লাহ্তায়ালার বিধান আমাদেরকে মেনে নিতেই হবে। না হলে আল্লাহ্তায়ালার শাস্তি নেমে আসবে আমাদের উপর।

সদুপদেশ ঢুকলো না কাবিলের কানে। উল্টো সে যুক্তি প্রদর্শন করলো, আকলিমা আমারই জোড়া। সে আর আমি একই সঙ্গে ছিলাম মাতৃগর্ভে। সুতরাং এখনো আমরা এক সঙ্গে থাকবো। আর তাছাড়া সুন্দরী সে। আমি ভালোবাসি আকলিমাকে। সুন্দরী আকলিমাকে ছেড়ে দিয়ে আমি হাবিলের গর্ভবোন লিমুজার মতো মেয়েকে বিয়ে করতে পারি না। হে পিতা, আমার ইচ্ছা অনুযায়ী আমার বিয়ে দিন আপনি। পিতা আপনি। আপনার তো পক্ষপাত দোষ থাকা অনুচিৎ। আপনি হাবিলকে বেশী ভালোবাসেন। তাই তো সুন্দরী আকলিমার সঙ্গে আপনি বিয়ে দিতে চান তার।

কাবিলের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান হজরত আদম। প্রবৃত্তি তাকে কিভাবে কাবু করে ফেলেছে। তার সাথে শয়তানও তাকে শিখিয়েছে কুটতর্ক করবার কলাকৌশল।

হজরত আদম বললেন, বেশ। তুমি প্রমাণ দেখতে চাও? জানতে চাও আল্লাহ্তায়ালার সিদ্ধান্ত কি? তবে আল্লাহ্তায়ালার উদ্দেশ্যে কোরবানীর নিয়ত করো তোমরা দু'জনেই। তুমি আর হাবিল– তোমরা দু'জনেই তোমাদের কোরবানী রেখে এসো ঐ পাহাড়ে। যার কোরবানী আল্লাহ্তায়ালা কবুল করবেন, সে-ই বিয়ে করবে আকলিমাকে।

পিতার এই প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলো কাবিল। সে স্থিরনিশ্চিত ছিলো, তার কোরবানী আল্লাহ্তায়ালা কবুল করবেনই। আকলিমা তারই স্ত্রী হবে। শুধু শুধু হাবিলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে পিতাই জটিল করে তুলছেন ব্যাপারটাকে।

চাষাবাদ করতো কাবিল। সে ঠিক করলো, তার ক্ষেতের কিছু গম আর কিছু অন্যান্য শষ্যাদি কোরবানী হিসেবে সে পেশ করবে আল্লাহ্তায়ালার উদ্দেশ্যে। আর মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো, কোরবানী কবুল হোক আর না হোক, কুছ পরোয়া নেই, আকলিমাকে সে বিয়ে করবেই।

পশুপালন ছিলো হাবিলের পেশা। ভেড়া, দুম্বা, নানা জাতের পশুর পাল রক্ষণাবেক্ষণ করতো হাবিল। কোরবানীর উদ্দেশ্যে সে বাছাই করলো পালের সবচেয়ে সেরা পশুটি। আল্লাহ্তায়ালা প্রভু, প্রতিপালক। তাঁর দরবারে তো সর্বোত্তম জিনিসই কোরবানী করতে হয়।

হাবিল নিয়ত করলো মনে মনে, 'হে আমার আল্লাহ্! আমিতো তোমারই দাস। আমি তোমারই ইবাদত করি আর সকল অবস্থায় তোমার প্রতি নির্ভরও করি। আমার নছিবে তুমি আকলিমার বিবাহ মঞ্জুর করো আর নাই করো, সকল অবস্থায় আমি তোমার সিদ্ধান্তেই সন্তুষ্ট থাকবো।'

নির্দিষ্ট দিনে কাবিল হাবিল দু'জনই তাদের কোরবানী রেখে এলো পাহাড়ের পাদদেশে। দূর থেকে তারা দেখতে লাগলো, কখন আল্লাহ্তায়ালার আদেশে আকাশ থেকে নেমে আসবে আগুন।

তখন আল্লাহ্তায়ালার বিধান ছিলো এরকমই। কারো কোরবানী কবুল হলো কিনা তা আল্লাহ্পাক জানিয়ে দিতেন এভাবে....উন্মুক্ত প্রান্তরে বা পাহাড়ের পাদদেশে আল্লাহ্তায়ালার উদ্দেশ্যে কোরবানী রেখে দিতে হতো। তখন আকাশ থেকে এক আগুনের শিখা নেমে এসে কোরবানীর সামগ্রী জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিয়ে যেতো। আর আগুনের শিখা এসে কোরবানী না পোড়ালে বোঝা যেতো যে, আল্লাহ্পাক কবুল করেননি কোরবানী।

দূরে দাঁড়িয়ে কাবিল হাবিল দু'জনই দেখলো আকাশ থেকে নেমে এসে কোরবানীর সামগ্রী পুড়িয়ে দিয়ে আবার আকাশে মিলিয়ে গেলো আগুন। কার কোরবানী কবুল হলো কে জানে? কৌতুহলী হয়ে উঠলো দু'জনই। দু'জনই কাছে গিয়ে দেখলো হাবিলের কোরবানীই কবুল করেছেন আল্লাহ্পাক। আসমানী আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে গিয়েছে হাবিলের পশু। আর কাবিলের শষ্যসম্ভার যেভাবে রাখা ছিলো, ঠিক সে ভাবেই পড়ে আছে।

ক্ষোভে অভিমানে আত্মহারা হয়ে পড়লো কাবিল। একি রকম অবিচার। নিজেকে আর সামলিয়ে রাখতে পারলো না সে। তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো হাবিলের উপর। চিৎকার করে সে হাবিলকে শাসালো, লানাকতু-লান্নাকা-'আমি তোমাকে হত্যা করবোই।'

খাঁটি ইমানদার হাবিল। সে বিশ্বাস করে মানুষের হায়াত মউত সম্পূর্ণই আল্লাহ্তায়ালার নিয়ন্ত্রণে। অসীম অপার তাঁর কুদরত, শক্তিমত্তা, পরাক্রম। মৃত্যুর অভ্যন্তর থেকে তিনি জাগিয়ে তোলেন জীবনকে। আবার জীবনকে ঢেকে দেন মৃত্যুর গভীরে।

হাবিল বললো, 'ভাই আমার। আল্লাহ্তায়ালাই তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন প্রকাশ্যভাবে। এতে আমার কি অপরাধ বলো? কেনো তুমি অন্যায়ভাবে খুন করতে চাও আমাকে?'

কিন্তু কাবিল তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। বললো সে, 'আমি বুঝি না অতোশতো। আকলিমা আমার। আর আকলিমাকে পাবার অন্তরায় একমাত্র তুমিই। তাই তোমাকে আমি অবশ্যই খুন করবো।'

হাবিল বললো, 'বৃথা আস্ফালন করছো তুমি। পরহেজগার আর আল্লাহ্ভীরুদের কোরবানীই কবুল হয় আল্লাহ্তায়ালার দরবারে। তুমি আক্রমণ করলেও প্রতিআক্রমণ আমি করবো না তোমাকে। আমাকে হত্যা করলে আমার এবং তোমার পাপের বোঝা বহন করবে তুমি। আর জাহান্নাম হবে তোমার বাসস্থান। জালেমদের পরিণতি এরকমই হয়।'

কাবিল আর বলতে পারলো না কোনোকিছু। শুধু ফুঁসতে থাকলো রাগে। কিভাবে খুন করতে হয় তা যদি জানা থাকতো, তবে এই মুহূর্তেই সে খুন করে ফেলতো হাবিলকে।

হজরত আদম এবার স্থিরনিশ্চিত হলেন। আল্লাহ্তায়ালার সিদ্ধান্ত তিনি এবার বাস্তবায়ন করবেনই। কাবিলের জন্য দুঃখ হয়। কিন্তু পুত্রবাৎসল্যের কারণে তিনি তো আল্লাহ্তায়ালার হুকুম পালনে পিছপা হতে পারেন না।

শুভবিবাহ সম্পন্ন হলো হাবিলের সঙ্গে আকলিমার। আর কাবিলের সঙ্গে লিমুজার। শুরু হলো দুই ভাইয়ের স্বতন্ত্র সংসার জীবন।

কাবিল নিরুপায় হয়ে মেনে নিয়েছে পিতার সিদ্ধান্ত। কিন্তু অন্তরে তার ক্ষোভের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতেই থাকে সারাক্ষণ। লিমুজাকে তার ভালো লাগে না। আকলিমা পরের স্ত্রী এখন। কিন্তু তবু তার দিক থেকে কাবিল নিজের মনকে ফিরাতে পারে না কিছুতেই। তার চেতনার সমস্ত সীমানা জুড়ে সারাক্ষণ ভেসে ওঠে শুধু আকলিমারই মুখচ্ছবি।

হজরত আদম সেবার হজ্জ্ব করতে ইচ্ছা করলেন। কাবা শরীফ জেয়ারতের বাসনা অন্তরকে উথাল পাথাল করে চলেছে। আল্লাহ্ প্রেমের তুফান জেগেছে প্রাণে। বাড়ীর সবার কাছে বিদায় নিয়ে তিনি এক সময় রওয়ানা দিলেন মক্কা অভিমুখে। সংসারের চিন্তা এখন আগের মতো নেই। বড় দুই ছেলে সংসারী। আয় রোজগার করতে শিখেছে তারা। একজন চাষাবাদ করে। আর একজন করে পশুপালন। আর ছোটগুলোর দেখাশোনার জন্য তো হাওয়া আছেন।

হজরত আদমের হজ্বে যাওয়ার পর পরই কাবিলের মনে শয়তানী চিন্তা আবার নতুন করে জ্বলে উঠলো। পিতার জন্যই তো হাবিলের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে না সে। মাকে জানিয়েও কোনোকিছু লাভ হয় না। মা-টাও যেনো কি রকম মহিলা। বাবার কথাই মেনে নেয় নির্বিবাদে। এবার যাহোক কিছু একটা উপায় বের করতেই হবে। আর খুন করার নিয়ম যদি একবার তাকে শিখিয়ে দিতো কেউ।

হজরত আদমের জন্যই শয়তান এতোদিন ভিড়তে পারতো না কাছে। শয়তান ভাবে কাবিলটা বেশ। কি সুন্দর উদ্ধত আর বদমেজাজী। আর পরস্ত্রীলোভীও। হাবিলকে সে খুন করতে চায়। এবার তাকে শিখিয়ে দিতে হবে খুন করার কায়দা কৌশল। দলে ভেড়াতে হবে কাবিলকে।

একদিন এক অচেনা আগন্তুকের রূপ ধরে কাবিলের সামনে হাজির হলো ইবলিস। কর্মব্যস্ত কাবিল তার দিকে তাকিয়ে দেখলো এক অদ্ভুত দৃশ্য। অচেনা লোকটি একটি মোরগ ধরে তার মাথাটা একহাতে চেপে ধরলো একটি পাথরের উপর। তারপর আর এক হাতে আর একটি পাথর নিয়ে সজোরে আঘাত বসালো মোরগটির মাথায়। এক আঘাতেই ছটফট করতে করতে নিশ্চল হয়ে গেলো মোরগটি। একাজ করেই অদৃশ্য হয়ে গেলো আগন্তুক। আর কাবিল বুঝলো, আগন্তুকটি খুন করবার নিয়ম শিখিয়ে দিয়ে গেলো তাকে।

কাবিল ভাবে, বাহ্! কাজটাতো একেবারে সোজা। এটুকু বুদ্ধি এতোদিন তার মাথায় ঢোকেনি? মনস্থির করে সে.... এভাবেই খুন করতে হবে হাবিলকে। এভাবেই সরিয়ে ফেলতে হবে পথের কাঁটা।

কিন্তু কাজটা যে করতে হবে একেবারে গোপনে। বাড়ীতে লোকজন ভর্তি। এখানে হাবিলকে খুন করলে চিৎকার করে কাঁদবে মা। ছোট ভাইবোনগুলোও বাঁধাবে গোলযোগ। আর হজ্ব থেকে বাবা ফিরে এলে তো আর এক বিপদ। এতো বড় অপরাধ করবার পরও কি তাকে রেহাই দিবেন পিতা? তিনি আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশের মোকাবেলায় কোনো কিছুরই পরোয়া করেন না। তিনি যদি শাস্তি দেন কাবিলকে। যদি ঘোষণা করেন, খুনের বদলা খুন। তখন?

কাবিল সুযোগ খুঁজতে থাকে। লোকালয় থেকে দূরে কোথাও খুন করতে হবে হাবিলকে। হাঁ, যখন হাবিল তার পশুর পাল চরাতে যাবে জঙ্গলের দিকে, দূরে কোথাও কোনো বিরান চারণভূমিতে, তখনই খুন করতে হবে তাকে।

কিছুদিন পরে সুযোগ পেয়েও গেলো কাবিল। সুবর্ণ সুযোগ।

দূরে এক পাহাড়ের পাদদেশে বিস্তীর্ণ এক চারণভূমি।

পশুপাল নিয়ে দূরের সেই চারণভূমিতে একদিন গেলো হাবিল। তাকে অনুসরণ করলো কাবিল। লুকিয়ে রইলো গাছের আড়ালে সুযোগের অপেক্ষায়। দূর থেকে দেখলো, নিশ্চিন্তে এক গাছের ছায়ায় শুয়ে আছে হাবিল। চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। ঘুমিয়ে আছে কি জেগে আছে বোঝা যায় না।

পশুগুলো চরছে আপন মনে। এই তো সুযোগ।

সন্তর্পণে হাবিলের কাছে এগিয়ে গেলো কাবিল। আওয়াজ হলো না কোনো। চোখ বন্ধই করে আছে হাবিল। মনে হয় ঘুমিয়ে আছে নিশ্চিন্তে।

কাবিল পাশে পড়ে থাকা একটা বিরাট পাথর দু'হাতে উপরে তুলে ধরলো। আর সজোরে সেটি ছুঁড়ে মারলো হাবিলের মাথার উপর। মুহূর্ত মাত্র। চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে গেলো হাবিলের মস্তক। শরীরটা শুধু কিছুক্ষণ নড়া চড়া করে একেবারে স্থির হয়ে গেলো চিরদিনের জন্য।

স্থির হয়ে গেলো কাবিলও। নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো সে দাঁড়িয়ে থাকলো অনেকক্ষণ। পৃথিবীর প্রথম খুন। ভ্রাতৃহত্যা। হন্তারক কাবিল যেনো কেমন হয়ে গেলো মুহূর্তের জন্য। মনে হলো আকাশ পৃথিবী যেনো একাকার হয়ে যাচ্ছে। প্রখর রৌদ্রতপ্ত দিন যেনো মুহূর্তে পরিণত হয়ে গেলো ঘোর অন্ধকার রাতে। ভয়াবহ অন্ধকারে যেনো ঢেকে যাচ্ছে সারা পৃথিবী আর বনের বৃক্ষগুলো। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়গুলো যেনো চিৎকার করছে বিকট স্বরে, খুন, খুন, খুন।

ভয় পেয়ে গেলো কাবিল। এতো রক্ত হাবিলের। এতো লাল মানুষের রক্ত। এতো ভয়াবহ।

হুঁশ ফিরে এলো একসময় কাবিলের। এখানে তো কিছুতেই ফেলে রাখা যাবে না হাবিলের মরদেহ। এখানে লাশ পড়ে থাকলে যে জানাজানি হয়ে যাবে চারিদিকে। তখন কাবিলকে শাস্তি থেকে ঠেকিয়ে রাখবে কে? সরিয়ে ফেলতে হবে লাশ।

ভাইয়ের মরদেহ কাঁধে তুলে নিলো কাবিল। কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু কি করতে হবে, তা ঠাহর করতে পারলো না কাবিল। শুধু সে লোকালয়ের বিপরীতে চলতে লাগলো একটানা। চলতে চলতে পরিশ্রান্ত হলে লাশ নামিয়ে রাখে মাটিতে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার লাশ ঘাড়ে তুলে নিয়ে হাঁটতে থাকে নির্জন বনপ্রান্তরের পথ ধরে।

একদিন হঠাৎ কাবিল দেখলো এক অদ্ভুত দৃশ্য। দেখলো দু'টো কাক মারামারি করছে। প্রচণ্ড মারামারি। একজন আর একজনকে আক্রমণ করছে প্রচণ্ডভাবে। এক সময় একটি কাক পর্যুদস্ত হলো। অপর কাকটি উপর্যুপরি আঘাত হেনে মেরেই ফেললো প্রথম কাকটিকে। কাবিল দেখলো, জীবিত কাকটি তখন তার ঠোঁট দিয়ে একটি গর্ত খুঁড়ে ফেললো। তারপর মৃত কাকটিকে টেনে এনে সেই গর্তে রেখে তার উপরে ছোট ছোট পাথর ফেলতে লাগলো। এক সময় বহু পাথরের নিচে সম্পূর্ণ ঢেকে গেলো মৃত কাকের মরদেহ।

এই দৃশ্য দেখে নিজেকে ধিক্কার দিলো কাবিল। এতো বোকা সে– একটা কাকের মাথায় যে বুদ্ধি থাকে তার যে সেটুকু বুদ্ধিও নেই। নাকি খুন করলে মানুষ নেমে যায় পশু পাখিরও নিচের স্তরে?

কাবিলও কবর খুঁড়লো একটা। তারপর সে কবরে ভাইয়ের লাশ রেখে মাটি আর পাথর দিয়ে চাপা দিয়ে রাখলো। প্রচণ্ড প্রতিশোধস্পৃহা যেনো এতোক্ষণে পরিণত হয়েছে মমতায়। হায়। নিজের পাপগুলোকেও সে যদি এরকম মাটি চাপা দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতো। কিন্তু সে তো এখন চিহ্নিত হন্তারক। পৃথিবীর প্রথম খুনী। সে যে তার আপন ভাইকে হত্যা করেছে একজন রমণীর জন্য।

না। বাড়ীতে ফিরবার আর ইচ্ছা হলো না তার। পালিয়ে গেলো সে দূরে...বহু দূরে। ইয়েমেনের দিকে। সেখানেই সে বসবাস করতে লাগলো একাকী।

হজ্ব থেকে ফিরে এসে সবই জানতে পারলেন হজরত আদম। পরিবারের অন্যান্য সকলেই জানতে পারলো, হাবিলকে খুন করেছে কাবিল। তারপর সে পালিয়ে গেছে দূর দেশে। তার সন্ধান জানে না কেউ।

পুত্র শোকে মুষড়ে পড়েন হজরত আদম। মা হাওয়া কাঁদেন অঝোর ধারায়। এক সন্তান নিহত। আর এক সন্তান হন্তারক। তারপর পলাতক, নিরুদ্দেশ। শয়তান সফল হলো আর একবার। স্মরণ পথে জেগে উঠলো বার বার আল্লাহ্তায়ালার সেই অমোঘ বাণী–

'শয়তান যে প্রকাশ্য শত্রু তোমাদের একথা কি আমি জানাইনি?'

হজরত আদম প্রার্থনা জানান আল্লাহ্তায়ালার দরবারে, 'হে আমাদের প্রতিপালক। রক্ষা করো তুমি আমাদের আগামী বংশধরকে বিতাড়িত শয়তানের কুহক থেকে, প্রবৃত্তির হঠকারিতা থেকে।'

শোক প্রশমিত হয় এক সময়। জীবন তো থেমে থাকে না কারো শোকে কারো বেদনায়। কাল বয়ে চলে নিরবধি। আনন্দের উজালা দিবসও গত হয়ে যায়। শেষ হয় দুঃখের ব্যথাদীর্ণ রজনীও।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে শীশ একাই এক রকম। সংসারের দিকে যেনো তাঁর খেয়াল নেই মোটেও। তার অন্যান্য ভাইয়েরা সকলেই সংসারী। কেউ করে চাষাবাদ। কেউ করে পশুপালন। কিন্তু শীশ সারাক্ষণ ইবাদতেই মগ্ন থাকতে চায়। আর সবাইকে সব সময় দেয় সৎপরামর্শ। সব ভাইয়েরা ভালোবাসে তাঁকে খুব।

বয়ে চলে পৃথিবীর জীবন। বয়স বেড়ে যায় বাবা আদমের। মা হাওয়ার। প্রায় বিশবার সন্তান প্রসব করেছেন মা হাওয়া। প্রতিবারে একই সঙ্গে জন্ম নিয়েছে এক ছেলে আর তার সঙ্গে এক মেয়ে। বড় হয়েছে তারা সবাই। পূর্ববর্তী জোড়ার সঙ্গে

পরবর্তী জোড়ার বিয়ে শাদীও সম্পন্ন হয়েছে। পূর্ববর্তী গর্ভের ছেলের সঙ্গে পরবর্তী গর্ভের মেয়ে। আর পরবর্তী গর্ভের ছেলের সঙ্গে পূর্ববর্তী গর্ভের মেয়ে। এ ভাবে সবাই আবদ্ধ হয়েছে বিবাহ বন্ধনে।

পরিবার বড় হয়েছে। অনেকের ঘরে এসেছে সন্তান-সন্ততি। নাতি হয়েছে। পুতি হয়েছে। ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলেছে প্রপৌত্র আর দৌহিত্রের দল। তাদেরও অনেকে শুরু করেছে সংসার জীবন। বেড়ে যাচ্ছে এক এক করে তাদেরও সন্তান-সন্ততি। তাদের মধ্যেও যারা পৌঁছেছে যৌবনের সীমানায়, তারাও বিবাহিত জীবনের মাধ্যমে জারী রেখেছে তাদের নিজ নিজ বংশধারা।

বেড়ে চলেছে মানুষের সংখ্যা। দলে দলে বিভক্ত হয়ে তারা বসবাস শুরু করেছে বিভিন্ন স্থানে। সকলের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা দরকার। সবাইকে শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন, কিভাবে আল্লাহ্তায়ালার ইবাদত করতে হয়। কিভাবে শয়তানের প্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকতে হয়। আল্লাহ্তায়ালা কোন্ কোন্ বস্তুকে হালাল করেছেন। আর হারাম করেছেন কোনগুলোকে?

আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করবার দায়িত্ব দিলেন হজরত আদমকে। জানালেন, তিনি নবী। এই পৃথিবীতে তিনি আল্লাহ্তায়ালার প্রথম নবী, প্রথম খলিফা। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে দান করলেন সর্ব প্রথম শরীয়ত। নির্দেশ দিলেন হজরত আদম আ. কে, বলে দাও, 'আমি নবী। ঈমান আনো আমার প্রতি। আমার আল্লাহ্র প্রতি। অনুগত হও আমার। উচ্চারণ করো কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লহু আদম সফিউল্লহ্।

হজরত আদম আ. জানিয়ে দিলেন সবাইকে, নামাজ ফরজ। রোজা ফরজ। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকবার জন্য সকল সময়ে আল্লাহ্তায়ালার জিকিরে অন্তরকে জাগ্রত রাখা ফরজ। আর শুনে নাও আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃতদেহ, শুকরের মাংস আর রক্ত।

দীর্ঘ জীবন লাভ করলেন বাবা আদম। তার সঙ্গে মা হাওয়াও। এই পৃথিবীর আলো বাতাস আর মাটির পরশ মেখে হাজার বছর কেটে গেলো প্রায়। ইতিমধ্যে একটি পরিবার পরিণত হয়েছে অনেক পরিবারে। প্রথম পরিবারের আদলেই গড়ে উঠেছে সকল পরিবার। শিশুদের কান্না হাসি, প্রাত্যহিক রান্না বান্না। শিক্ষাদীক্ষা, চাষাবাদ, পশু পালন। বিবাহ শাদী। হাজার রকমের সাংসারিক সুখ দুঃখের সাথে চলেছে আল্লাহ্তায়ালার প্রেমময় ইবাদত।

প্রায় হাজার বছরের জীবন হজরত আদমের। কেমন করে যে পার হয়ে গেলো এতোটা সময়। এখন এই বৃদ্ধ বয়সে এসে চিন্তা যেনো থমকে দাঁড়িয়েছে হঠাৎ। এ কেমন জায়গা পৃথিবী। ঘর সংসার গোছাতে গোছাতে, সন্তান সন্ততি মানুষ করে তুলতে তুলতেই জীবন শেষ হয়ে আসে। তার উপরে আছে কতো শত জটিলতা। সম্পদ বণ্টন, ব্যবসা বাণিজ্য, চাষাবাদ, রোগ শোক জরা। পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মান অভিমান, ক্ষোভ, দ্বেষ, হানাহানি– কতো রকম সমস্যা যে মানুষের। তবু কিসের যেনো এক আকর্ষণ জমে যায় মনে। সবকিছু ছাপিয়ে বার বার জেগে ওঠে অন্তরে কী এক প্রেমাতুর পিপাসা। আপনজনদের নিয়ে গড়ে ওঠা মহব্বতের এই মজলিশে মোহিত হয়ে যায় মন।

কিন্তু মৃত্যু যে অনড় বিধান। স্থায়ী স্থান নয় এ পৃথিবী। মৃত্যুর তোরণ পেরিয়ে চিরন্তন জীবনের দিকে যেতে যে হবেই সবাইকে।

হজরত আদম প্রস্তুত হন পরপারের পাড়ি জমাবার জন্য। মনে হয় এবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এই নশ্বর জীবন। বিধায় নিতে হবে মানুষের মেলা থেকে।

কর্তব্যচেতন হয়ে ওঠেন তিনি। সন্তানদেরকে ঢেকে উপদেশ দেন– 'দেখো বাছারা, বৃদ্ধ হয়েছি আমি। মনে হয় দুনিয়ার জীবন শেষ হয়ে আসছে আমার। সহসাই আমাকে চলে যেতে হবে হয়তো।'

মনোযোগ সহকারে পিতার কথা শোনেন সকলে। শোনেন শীশ ও অন্যান্য সকল সন্তানেরা।

হজরত আদম বলেন, 'খুবই কঠিন জায়গা এই পৃথিবী। শয়তান তোমাদেকে পথভ্রষ্ট করবার জন্য সব সময় ওৎ পেতে আছে। শয়তানের ফাঁদ থেকে সব সময় দূরে থাকতে চেষ্টা করো তোমরা। তোমরা যদি পথভ্রষ্ট হয়ে যাও, তবে তোমাদের

জন্য নির্ধারিত হবে জাহান্নামের আগুন। আর আমিও লজ্জিত হবো এ জন্যে। হে আমার প্রিয় ফরজন্দেরা। শয়তানের অনুসরণ থেকে আর পাপ থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা কোরো তোমরা।'

হজরত আদম বলেই চলেন, 'হে আমার আওলাদেরা, দুনিয়ার মোহে জড়িয়ে পড়ো না কখনো। এ জীবন তো অস্থায়ী। তোমাদের সবাইকে একদিন না একদিন চলে যেতেই হবে এই পৃথিবী ছেড়ে। সুতরাং কর্তব্যকর্মে গাফিলতি যেনো না হয়। আরো শোনো, স্ত্রীলোকদের পরামর্শ বিনা বিবেচনায় গ্রহণ করা ঠিক নয়। আমি তোমাদের মায়ের অনুরোধে ডান বাম চিন্তা না করেই বেহেশতের গন্ধম খেয়েছিলাম। তখন যদি আমি চিন্তা করে দেখতাম তার পরামর্শ, তবে হয়তো ভুল করতাম না কিছুতেই। আরো শোনো, কোনো কাজে যদি তোমাদের অন্তর সায় না দেয়, তবে সে কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে চেষ্টা কোরো। আমার স্পষ্ট মনে আছে গন্ধম ভক্ষণের পূর্ব মুহূর্তে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগেছিলাম আমি। হায়। যদি তখন আমি অন্তরের কথা মানতাম। আর একটি ব্যাপারে সতর্ক থেকো। গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করার আগে শুভাকাঙ্খী বন্ধুজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করে নিও কিন্তু। তাহলে কাজে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকবে খুবই কম। আমি যদি গন্ধম খাওয়া ঠিক হবে কিনা– এ ব্যাপারে বন্ধু ফেরেশতাদের পরামর্শ কামনা করতাম, তবে নিশ্চয়ই গন্ধম খাওয়ার বিরুদ্ধে উপদেশ পেতাম আমি।'

নসিহতনামা শেষ করে হজরত শীশের দিকে তাকালেন হজরত আদম। তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন– বাবা শীশ। আমার নসিহতগুলি মনে রেখো তুমি। সবাইকে সৎপরামর্শ দিও। আমার পরে আল্লাহ্তায়ালা তোমাকেই নবুয়ত দান করবেন। সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহ্র উপরেই নির্ভরশীল থাকতে চেষ্টা কোরো। আগামী পৃথিবীতে আরো অনেক নবী আসবেন। তাদের উপর ঈমান রেখো। নবীদের নেতা যিনি, তিনি আসবেন একেবারে শেষ জামানায়। তাঁর মোবারক নাম হবে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তিনিই হবেন শেষ নবী। আল্লাহ্তায়ালার হাবীব তিনি। তোমার বংশেই তিনি আসবেন বহু সহস্র বছর পরে। তাঁর কথা তুমি জানিয়ে দিও সবাইকে। আর হুঁশিয়ার হও। আমি তোমাকে আমার খলিফা নির্বাচন করছি। আমার প্রতি যে শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর অটলভাবে কায়েম থাকতে হবে তোমাকে। শরীয়তের উপরে আমল করা ফরজ– একথা বলে দিও সবাইকে।

শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন হজরত আদম। রোগজর্জরিত শরীরে বল নেই। ইবাদত বন্দেগী বিঘ্নিত হতে চায়। মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায় এজন্য। মাওলার ইবাদত মনমতো না করতে পারলে এভাবে বেঁচে থাকার কোনো মানে আছে?

আল্লাহ্তায়ালার কতো মেহেরবানী। কতো দয়া। কতো ভালোবাসা। মহা মানুষের মহাজীবনের সূচনা ঘটিয়েছেন। আল্লাহ্পাক তাঁকে দিয়েই। বানিয়েছেন প্রথম মানুষ। মানুষের প্রথম পিতা। যাত্রা শুরু হয়েছে সেই আলমে আরওয়াহ্ থেকে। তারপর বেহেশতের নিরুপদ্রব জ্যোতির্ময় জীবন। সেই সুখময় জীবনের একাকীত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছেন হাওয়াকে দিয়ে। ক্ষমা করেছেন সকল অপরাধ। পতনের পর দিয়েছেন প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা। হারাবার পর দিয়েছেন প্রাপ্তির সংবাদ। দিয়েছেন বুকভরা প্রেম ভালোবাসা স্রষ্টার জন্য, সৃষ্টির জন্য।

কী অপার সৃষ্টিকৌশল তাঁর। কী অতুলনীয় শক্তিমত্তা। আরো কতো সুন্দর সৃষ্টি পরিকল্পনা। একটি মানুষ থেকে দু'টি। তারপর একে একে অনেক।

আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র বাণী, 'হে মানুষ, তোমরা অবলম্বন করো সেই মহামহিম প্রভু পরওয়ারদিগারের ভয় ও ভক্তি, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মানুষ থেকে। আর তার মধ্য থেকেই আর একজনকে সাথী হিসাবে। তারপর সেই যুগল মানুষ থেকে ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি করেছেন বহু মানুষ।'

আল্লাহ্তায়ালার বাণী সত্য। প্রথমে এতোবড় এই পৃথিবীতে ছিলো শুধু দু'টিমাত্র জীবনের স্পন্দন। আর এখন হয়েছে হাজার হাজার। আগামী পৃথিবীতে আরো কতো মানুষ আসবে কে জানে?

এখনও যে অনেক পথ বাকী। মানবতাকে পাড়ি দিতে হবে আরো অনেক দূরত্ব। মানুষেরাই ক্রমে ক্রমে গড়ে তুলবে রাষ্ট্র। দেশ। মহাদেশ। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তরে জন্ম নিবে অগণিত মানব শিশু। চলবে চাষাবাদ। শিল্প। বাণিজ্য। চলবে নতুন নতুন আবিষ্কারের অভিযান। জয় করবে তারা তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমস্ত সাগর। মহাসাগর। অধিকারে আসবে মহাশূন্যের কতো যে অজানা রহস্য। সমৃদ্ধ করবে

মানুষেরা জ্ঞানের বিশাল পরিধি। গড়ে তুলবে প্রজ্ঞা ও প্রেমের সহস্র কালজয়ী মিনার। জ্বলে উঠবে সাহিত্য। দর্শন। ইতিহাস। হেসে উঠবে জ্ঞান বিজ্ঞানের শত সহস্র সূর্য। নক্ষত্ররাজি।

কে জানে আরো কতো বিচিত্র অভিধায় জেগে উঠবে আগামী পৃথিবীর মানুষ। যতোকিছুই করুক না কেনো তারা, বার বার বুঝবে, সকল জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্পাকই। সমস্ত ক্ষমতার প্রকৃত মালিক একমাত্র তিনিই। তাঁর কাছে ফিরে যেতেই হবে সবাইকে।

আল্লাহ্তায়ালার বিধান অনড়। অনতিক্রম্য। নির্ভুল। নিখুঁত। দিনরাত্রির বিবর্তন আর আকাশ পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্যের আবরণ উন্মোচন করতে গিয়ে প্রতিপদে মানুষ আবিষ্কার করবে একথা।

রোগযন্ত্রণা দিন দিন বেড়েই চলে হজরত আদমের। একদিন তিনি এরশাদ করলেন, 'আমাকে জয়তুন তেল এনে দাও।'

তাঁর কথা শুনে উপস্থিত সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। তখন হজরত আদমের হঠাৎ স্মরণ হলো, তাইতো, পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত তো জয়তুন তেলের ব্যবহার জানে না কেউ। জয়তুন তেল তো তিনি দেখেছিলেন বেহেশতে।

একথা মনে হতেই তিনি বললেন, তাইতো। দুনিয়ায় তো নয়। জয়তুন তেল আমি দেখেছিলাম বেহেশতে।

এরপর হজরত শীশকে লক্ষ্য করে নির্দেশ দিলেন, বাবা শীশ। তুমি তুর পর্বতের দিকে যাও। সেখানে গিয়ে আমার জন্য আল্লাহ্তায়ালার দরবারে মোনাজাতের মাধ্যমে একথা জানাও যে, হে আমাদের আল্লাহ্। আপনার বান্দা আদম শয্যাশায়ী। তিনি আপনার নিকট জয়তুন তেল যাচ্ঞা করছেন। তাঁর আশা তাঁর প্রার্থনা আপনি কবুল করবেন।

পিতার কথা মতো তুর পর্বতে গিয়ে প্রার্থনা জানালেন হজরত শীশ। হজরত শীশের প্রার্থনা শেষ হবার পর পরই প্রত্যাদেশ হলো, 'আমি প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা কবুল করি।'

একটু পরেই হজরত শীশ দেখতে পেলেন একজন জ্যোতির্ময় ফেরেশতা জয়তুন তেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হজরত শীশ সেই ফেরেশতার দিকে একটি কাঠের পাত্র এগিয়ে দিলেন। ফেরেশতাটি সেই পাত্র জয়তুন তেল দিয়ে পূর্ণ করে দিলেন।

জয়তুন তেল পেয়ে খুবই আনন্দিত হলেন হজরত আদম। কিছু তেল পান করলেন তিনি। আর কিছু মালিশ করলেন শরীরে। এতে রোগযন্ত্রণা উপশম হলো অনেক। শরীরে তিনি শক্তি ফিরে পেলেন কিছুটা।

কিন্তু হলে কি হবে। দুনিয়ার প্রতি তিনি একেবারে উদাসীন হয়ে যেতে লাগলেন যেনো দিন দিন। দিন রাত্রির অধিকাংশ সময় শুধু বেশেতের কথাই মনে হয়। আর বেহেশতের কথা মনে হলেই অঝোর ধারায় কাঁদতে কাঁদতে আরো বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েন হজরত আদম।

একদিন শীশকে ডেকে বললেন, 'বাবা শীশ। আবার তুর পাহড়ে যাও তুমি। আল্লাহ্তায়ালার দরবারে আবার মোনাজাত করে বলো, হে আমাদের প্রতিপালক, আপনার বান্দা আপনার নিকট বেহেশতের মেওয়া প্রার্থী।

হজরত শীশ তাঁর কয়েকজন ভাইকে নিয়ে আবার তুর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হলেন। পথে কয়েকজন ফেরেশতার সঙ্গে দেখা হলো তাঁদের। হজরত জিব্রাঈল আ.ও ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। হজরত জিবরাইল আ. জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আদম সন্তানেরা, কোথায় রওয়ানা দিয়েছেন আপনারা?'

হজরত শীশ বললেন, তুর পাহাড়ে যাচ্ছি আমরা। সেখানে গিয়ে আমরা আমাদের পিতার জন্য বেহেশতের মেওয়া প্রার্থনা করবো আল্লাহ্তায়ালার সমীপে।

হজরত জিবরাইল আ. বললেন 'ফিরে চলুন আপনারা। মেওয়া নিয়ে আমরা আপনাদের পিতার কাছেই যাচ্ছি। তখন সবাই মিলে হজরত আদমের নিকট উপস্থিত হলেন তাঁরা। হজরত জিবরাইল হজরত আদমের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

হজরত আদম বললেন, 'আমি দাঁড়াতে অক্ষম। ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।'

হজরত জিবরাইল বললেন, 'হে আদম সফিউল্লাহ। একটু ধৈর্য ধারণ করুন। আপনার কষ্ট দূর হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।'

কথা বলতে বলতেই হজরত আজরাইল আ. উপস্থিত হলেন সেখানে। হজরত হাওয়া বসে ছিলেন হজরত আদমের শয্যাপাশে। হজরত আজরাইলকে দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন।

হজরত আদম বললেন, হাওয়া তুমি সরে যাও এখান থেকে। ফেরেশতাদের এই জামাতের সঙ্গে আমি বাক্যালাপ করবো এখন।

স্বামীর নির্দেশে সেখান থেকে সরে গেলেন হাওয়া। হজরত আদম বললেন, 'ভাই জিবরাইল আমি বুঝতে পারছি, যাওয়ার সময় হয়েছে আমার। আমাকে শুধু একটা কথা বলো, আসমানের ফেরেশতারা কি এখনো আমার সেই গোনাহ্র কথা মনে রেখেছে?

একথা বলেই কেঁদে ফেললেন হজরত আদম। উপস্থিত ফেরেশতারাও কেঁদে ফেললেন একথা শুনে। সেই মুহূর্তে দূর আরশে মোয়াল্লা থেকে স্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এলো, 'হে আমার প্রিয় সৃষ্টি আদম। তুমিতো মাসুম। নিষ্পাপ। আমি তোমার প্রতি ঘোষণা করছি আমার পূর্ণ সন্তুষ্টি।'

তখনই খুলে গেলো আসমানের সকল আবরণ। হজরত আদম একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন, ঐতো সেই কাঙ্খিত বেহেশত দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। কী নূরানী ঝলক। হজরত আদম দেখতে লাগলেন, হুর গেলেমান সবাই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার আয়োজন করছে।

তিনি বললেন, ভাই জিব্‌রাইল, ত্বরা করো।

হজরত জিব্‌রাইল আ. বললেন, ' হে আজরাইল। আল্লাহ্‌পাক তাঁকে নিজ কুদরতি হাতে গড়েছেন। আসানির সঙ্গে জান কবজ করো তাঁর।'

তারপর মুহূর্ত মাত্র। আল্লাহ্‌ প্রেমের অনন্ত তৃষ্ণা নিয়ে নশ্বর পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য চলে গেলেন হজরত আদম সফিউল্লাহ্‌।

শোকে ভেঙ্গে পড়লেন পরিবারের সবাই। স্বামীঅন্তপ্রাণা হাওয়া কাঁদতে লাগলেন বিলাপ করে। তাঁর সেই কান্না আর থামলো না। কান্না শেষ হবার আগে তিনিও অনুসরণ করলেন প্রিয়তম স্বামীকে।

মাত্র কয়েকদিন পরে তিনিও তাঁর প্রিয় সন্তান সন্ততিদের ছেড়ে চিরবিদায় নিলেন মাটির পৃথিবী থেকে।

এই হলো প্রথম পরিবারের ইতিবৃত্ত। সেই পরিবারই আজ পরিণত হয়েছে কোটি কোটি পরিবারে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ মহাদেশ আজ ভরে গেছে মানুষে। দেশে দেশে মানুষের প্রবহমান জীবনের মতো নিরবধি বয়ে চলেছে কতো শত নদী। রাইন, নীল, ফোরাত, দজলা, টেমস, ভলগা। আবার কোথাও ঝিলাম, গঙ্গা, যমুনা, আমুর, হোয়াং হো। আর এই শ্যামল বাংলাদেশে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিতাস, ইছামতি। এসব নদীবিধৌত দেশে মানুষেরা গড়ে তুলেছে বিচিত্র জনপদ, বন্দর। সারা পরিবারের এতোগুলো মানুষ আমরা আজ একে অন্যের কতো অচেনা। বিশ্ব নিখিল আত্মীয়তার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে আজ কতো শত ফাটল।

কতো সহস্র আবরণ। নিজেদেরকে না চিনে, পারিবারিক কাহিনী ভুলে গিয়ে কী নিষ্ঠুরভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে। নিখিল আত্মীয়তার অনুভূতি অন্তর থেকে উঠে গিয়েছে আমাদের। কী নিষ্ঠুরভাবে ভাগ করে নিয়েছি আমরা এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটাকে। যে পৃথিবী পরিত্যাগ করে চলে যেতেই হবে সবাইকে, সে পৃথিবীকেই স্থায়ী বলে ভাবতে শুরু করেছি অনেকে। হয়েছি প্রবৃত্তির দাসানুদাস। শয়তানের ক্রীড়নক।

আসুন বিশ্ববাসী। স্মরণ করি, ভুল করা আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্য। তার সাথে প্রত্যাবর্তনও। তওবার তোরণ এখোনো উন্মুক্ত রাখা হয়েছে আমাদের জন্য। চলুন, আমাদের আদি পিতার আদলে অনুতাপের অশ্রুসাগরে মুক্তির কিশ্‌তী ভাসিয়ে দিই আমরা।

প্রথম পরিবার

ISBN 984-70240-0034-7